সমাজ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গদ্যগ্রন্থাবলী, ১৩শ ভাগ

সমাজ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস—এলাহাবাদ

১৯১৮

মূল্য ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

প্রাপ্তিস্থান

১। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্,

২২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

২। ইণ্ডিয়ান প্রেস্—এলাহাবাদ।

এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস হইতে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচি

আচারের অত্যাচার

ইংরাজদের পাউন্ড আছে, শিলিং আছে, পেনি আছে, ফার্দিং আছে—আমাদের [illegible] আছে, [illegible] আছে, [illegible] আছে, কান্তি আছে, দন্তি আছে, কাক আছে, তিল আছে।

[illegible] জাতি [illegible] ধরে না, ছাড়িয়া দেয়। আমরা ক্রান্তি [illegible] ধরি, ছাড়ি না।

হিন্দু বলেন, [illegible] বড়াগণ্ডাটি বাদ যায় না, [illegible] কড়াক্রান্তিটিও [illegible] না। [illegible] হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানের বড়াগণ্ডাটি পর্যন্ত [illegible] নাই। বড়াগণ্ডাটি [illegible] ভাবিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। [illegible]

সকল দিক সমানভাবে রক্ষা করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই জন্য মানুষকে কোনো না কোনো বিষয়ে রফা করিয়া চলিতেই হয়।

কেবলমাত্র যদি হিসাব লইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তুমি কড়া, ক্রান্তি, দন্তি, কাক, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশ লইয়া, ঘরে বসিয়া, পাটিগণিতের বিচিত্র সমস্যা পূরণ করিতে পার। কিন্তু কাজে নামিলেই অতি সূক্ষ্ম অংশগুলি ছাঁটিয়া চলিতে হয়, নতুবা হিসাব মিলাইতে মিলাইতে কাজ করিবার সময় পাওয়া যায় না।

কারণ, সীমা ত এক জায়গায় টানিতেই হইবে। তুমি সূক্ষ্ম-হিসাবী, দন্তি কাক পর্যন্ত হিসাব চালাইতে চাও, তোমার চেয়ে সূক্ষ্মতর হিসাবী বলিতে পারেন, কাকে গিয়াই বা থামিব কেন? বিধাতার দৃষ্টি যখন অনন্ত সূক্ষ্ম, তখন আমাদের জীবনের হিসাবও অনন্ত সূক্ষ্মের

দিকে টানিতে হইবে। নহিলে তাঁহার সম্পূর্ণ সন্তোষ হইবে না—তিনি ক্ষমা করিবেন না।

বিশুদ্ধ তর্কের হিসাবে ইহার বিরুদ্ধে কাহারো কথা কহিবার যো নাই—কিন্তু কাজের হিসাবে দেখিতে গেলে জোড়হস্তে বিনীতস্বরে আমরা বলি—"প্রভু আমাদের অনন্ত ক্ষমতা নাই, সে তুমি জান। আমাদিগকে কাজও করিতে হয় এবং তোমার কাছে হিসাবও দিতে হয়। আমাদের জীবনের সময়ও অল্প এবং সংসারের পথও কঠিন। তুমি আমাদিগকে দেহ দিয়াছ মন দিয়াছ, আত্মা দিয়াছ ক্ষুধা দিয়াছ বুদ্ধি দিয়াছ প্রেম দিয়াছ। এবং এই সমস্ত বোঝা লইয়া আমাদিগকে সংসারের সহস্র লোকের সহস্র বিষয়ের আবর্তের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছ। ইহার উপরেও পণ্ডিতেরা ভয় দেখাইতেছেন, তুমি হিন্দুর দেবতা অতি কঠিন, তুমি কড়াক্রান্তি দণ্ডপলকের হিসাবও ছাড় না। তা যদি হয়, তবে ত হিন্দুকে সংসারের কোনো প্রকৃত কাজে, মানবের কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অবসর দেওয়া হয় না। তবে ত তোমার বড় কাজ ফাঁকি দিয়া, কেবল তোমার ক্ষুদ্র হিসাব বসিতে হয়। তুমি যে শোভাসৌন্দর্য্যবৈচিত্র্যময় সাগরাম্বরা পৃথিবীতে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছ, সে পৃথিবী ত পর্য্যটন করিয়া দেখা হয় না, তুমি যে উন্নত মানববংশে আমাদিগকে জন্মদান করিয়াছ, সেই মানবদের সহিত সম্যক্ পরিচয় এবং তাহাদের দুঃখমোচন, তাহাদের উন্নতিসাধনের জন্য বিচিত্র কর্ম্মানুষ্ঠান, সে ত অসাধ্য হয়। কেবল ক্ষুদ্র পরিবারে, ক্ষুদ্র গ্রামে বদ্ধ হইয়া, গৃহকোণে বসিয়া, গতিশীল বিপুল মানবপ্রবাহ ও জগৎসংসারের প্রতি দৃকপাত না করিয়া আপনার ক্ষুদ্র দৈনিক জীবনের কড়াক্রান্তি গণিতে হয়। ইহাকে স্পর্শ করিব না, তাহার ছায়া মাড়াইব না, অমুকের অন্ন খাইব না, অমুকের কন্যা গ্রহণ করিব না, এমন করিয়া উঠিব, অমন করিয়া বসিব, তেমন করিয়া চলিব, তিথি, নক্ষত্র, দিন,

ক্ষণ, লগ্ন বিচার করিয়া হাত পা নাড়িব, এমন করিয়া কর্ম্মহীন ক্ষুদ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া, কাহনকে কড়া কড়িতে ভাঙ্গিয়া স্তূপাকার করিয়া তুলিব, এই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য? হিন্দুর দেবতা, এই কি তোমার বিধান যে, আমরা কেবল মাত্র "হিঁদু" হইব, মানুষ হইব না?"

ইংরাজিতে একটা কথা আছে—"পেনি ওয়াইজ্ পাউণ্ড ফুলিশ" —বাংলায় তাহার তর্জ্জমা করা যাইতে পারে—কড়ায় কড়া কাহনে কানা। অর্থাৎ কড়ার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিতে গিয়া কাহনের প্রতি ঢিলা দেওয়া হয়। তাহার ফল হয়, "বজ্র আঁটন ফস্কা গিরো"— প্রাণপণ আঁটুনির ত্রুটি নাই কিন্তু গ্রন্থিটি শিথিল।

আমাদের দেশেও হইয়াছে তাই। বিধি-ব্যবস্থা, আচার-বিচারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ করিতে গিয়া, মনুষ্যত্বের স্বাধীন উচ্চ অঙ্গের প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে।

সামাজিক আচার হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মনীতির ধ্রুব অনুশাসন-গুলি পর্য্যন্ত সকলেরই প্রতি সমান কড়াক্কড় করাতে, ফল হইয়াছে, আমাদের দেশে সমাজনীতি ক্রমে সুদৃঢ় কঠিন হইয়াছে কিন্তু ধর্ম্মনীতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। এক জন লোক গরু মারিলে সমাজের নিকট নির্যাতন সহ্য করিবে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিবে, কিন্তু মানুষ খুন করিয়া সমাজের মধ্যে বিনা প্রায়শ্চিত্তে স্থান পাইয়াছে এমন দৃষ্টান্তের বোধ করি অভাব নাই। পাছে হিন্দুর বিধাতার হিসাবে কড়াক্রান্তির গরমিল হয়, এই জন্য পিতা অষ্টমবর্ষের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দেন এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে জাতিচ্যুত হন; বিধাতার হিসাব মিলাইবার জন্য সমাজের যদি এতই সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে তবে উক্ত পিতা নিজের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের শত শত পরিচয় দিলেও কেন সমাজের মধ্যে আত্মগৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে? ইহাকে কি কাকদন্তির হিসাব

বলে? আমি যদি অস্পৃশ্য নীচ জাতিকে স্পর্শ করি, তবে সমাজ তৎক্ষণাৎ সেই দস্তি-হিসাব সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করিয়া দেন, কিন্তু আমি যদি উৎপীড়ন করিয়া সেই নীচ জাতির ভিটামাটি উচ্ছিন্ন করিয়া দিই, তবে সমাজ কি আমার নিকট হইতে সেই কাহনের হিসাব তলব করেন? (প্রতিদিন রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, মিথ্যাচরণে ধর্ম্মনীতির ভিত্তিমূল জীর্ণ করিতেছি, অথচ স্নান, তপ, বিধিব্যবস্থার তিলমাত্র ত্রুটি হইতেছে না। এমন কি দেখা যায় না?)

আমি বলি না যে, হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্মনীতিমূলক পাপকে পাপ বলে না। কিন্তু মনুষ্যকৃত সামান্য সামাজিক নিষেধগুলিকেও তাহার সমশ্রেণীতে ভুক্ত করাতে যথার্থ পাপের ঘৃণ্যতা স্বভাবতই হ্রাস হইয়া আসে। অত্যন্ত বৃহৎ ভিড়ের ভিতর শ্রেণীবিচার দুরূহ হইয়া উঠে। অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা, এবং সমুদ্রযাত্রা হইতে নরহত্যা পর্য্যন্ত সকল পাপই আমাদের দেশে গোলে হরিবোল দিয়া মিশিয়া পড়ে।

পাপখণ্ডনেরও তেমনি শত শত সহজ পথ আছে। আমাদের পাপের বোঝা যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে, তেমনি যেখানে সেখানে তাহা ফেলিয়া দিবারও স্থান আছে। গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলাম, অমনি গাত্রের ধূলা এবং ছোট বড় সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেল। যেমন রাজ্যে বৃহৎ মড়ক হইলে প্রত্যেক মৃত দেহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গোর দেওয়া অসাধ্য হয়, এবং আমীর হইতে ফকীর পর্য্যন্ত সকলকে রাশীকৃত করিয়া এক বৃহৎ গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া সংক্ষেপে অন্ত্যেষ্টি-সৎকার সারিতে হয়—আমাদের দেশে তেমনি খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে এত পাপ যে, প্রত্যেক পাপের স্বতন্ত্র খণ্ডন করিতে গেলে সময়ে কুলায় না; তাই মাঝে মাঝে একেবারে ছোট বড় সকল-গুলাকে কুড়াইয়া অতি সংক্ষেপে এক সমাধির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিতে হয়। যেমন বজ্র আঁটন তেমন ফস্কা গিরো।

এইরূপে, পাপ পুণ্য যে মনের ধর্ম্ম, মানুষ ক্রমে সেটা ভুলিয়া যায়। মন্ত্র পড়িলে, ডুব মারিলে, গোময় খাইলে যে পাপ নষ্ট হইতে পারে এ বিশ্বাস মনে আনিতে হয়। কারণ মানুষকে যদি মানুষের হিসাবে না দেখিয়া যন্ত্রের হিসাবে দেখ, তবে তাহারও নিজেকে যন্ত্র বলিয়া ভ্রম হইবে। যদি সামান্য লাভ লোকসান ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া আর কোনো বিষয়েই তাহার স্বাধীন বুদ্ধিচালনার অবসর না দেওয়া হয়—যদি ওঠাবসা, মেলামেশা, ছোঁওয়া খাওয়াও তাহার জন্য দৃঢ় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তবে মানুষের মধ্যে যে একটা স্বাধীন মানসিক ধর্ম্ম আছে সেটা ক্রমে ভুলিয়া যাইতে হয়। পাপ পুণ্য সকলই যন্ত্রের ধর্ম্ম মনে করা অসম্ভব হয় না এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তও যন্ত্রসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু অতি সূক্ষ্ম যুক্তি বলে, যদি মানুষের স্বাধীন বুদ্ধির প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র নির্ভর করা যায় তবে দৈবাৎ কাকদন্তির হিসাব না মিলিতে পারে। কারণ মানুষ ঠেকিয়া শেখে—কিন্তু তিলমাত্র ঠেকিলেই যখন পাপ, তখন তাহাকে শিখিতে অবসর না দিয়া নাকে দড়ি দিয়া চালানই যুক্তিসঙ্গত। ছেলেকে হাঁটিতে শিখাইতে গেলে পড়িতে দিতে হয়, তাহা অপেক্ষা তাহাকে বুড়াবয়স পর্য্যন্ত কোলে করিয়া লইয়া বেড়ানই ভাল। তাহা হইলে, তাহার পড়া হইল না, অথচ গতিবিধিও বন্ধ হইল না। ধূলির লেশমাত্র লাগিলে হিন্দুর দেবতার নিকট হিসাব দিতে হইবে, অতএব মনুষ্যজীবনকে তেলের মধ্যে ফেলিয়া শিশির মধ্যে নীতি-মিউজিয়ামের প্রদর্শনদ্রব্যের স্বরূপ রাখিয়া দেওয়াই সুপরামর্শ।

ইহাকেই বলে কড়ায় কড়া, কাহনে কানা। কি রাখিলাম আর কি হারাইলাম সে কেহ বিচার করিয়া দেখে না। কবিকঙ্কণে বাণিজ্য-বিনিময়ে আছে—

> "শুকুতার বদলে মুকুতা দিবে
> ভেড়ার বদলে ঘোড়া।

আমরা পণ্ডিতেরা মিলিয়া অনেক যুক্তি করিয়া শুক্তার বদলে মুক্তা দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। মানসিক যে স্বাধীনতা না থাকিলে পাপপুণ্যের কোনো অর্থই থাকে না, সেই স্বাধীনতাকে বলি দিয়া নামমাত্র পুণ্যকে তহবিলে জমা করিয়াছি।

পাপপুণ্য, উত্থানপতনের মধ্য দিয়া আমাদের মনুষ্যত্ব উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে। স্বাধীনভাবে আমরা যাহা লাভ করি সেই আমাদের যথার্থ লাভ; অবিচারে অন্যের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করি তাহা আমরা পাই না। ধূলি কর্দ্দমের উপর দিয়া, আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া, পতন-পরাভব অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে যে বল সঞ্চয় করি, সেই বলই আমাদের চিরজীবনের সঙ্গী। মাটিতে পদার্পণ মাত্র না করিয়া, দুগ্ধফেনশুভ্র পুণ্যশয্যায় শয়ান থাকিয়া হিন্দুর দেবতার নিকটে জীবনের একটি অতি নিষ্কলঙ্ক হিসাব প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়—কিন্তু সে হিসাব কি? একটি শূন্য শুভ্র খাতা। তাহাতে কলঙ্ক নাই এবং অঙ্কপাত নাই। পাছে কড়া ক্রান্তি কাক দন্তির গোল হয় এই জন্য আয় ব্যয় স্থিতিমাত্র নাই।

নিখুঁৎ সম্পূর্ণতা মনুষ্যের জন্য নহে। কারণ, সম্পূর্ণতার মধ্যে একটা সমাপ্তি আছে। মানুষ ইহজীবনের মধ্যেই সমাপ্ত নহে। যাঁহারা পরলোক মানেন না, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন, একটি জীবনের মধ্যেই মানুষের উন্নতি সম্ভাবনার শেষ নাই।

নিম্নশ্রেণীর জন্তুরা ভূমিষ্ঠকাল অবধি মানব-শিশুর অপেক্ষা অধিকতর পরিণত। মানবশিশু একান্ত অসহায়। ছাগশিশুকে চলিবার আগে পড়িতে হয় না। যদি বিধাতার নিকট চলার হিসাব দিতে হয় তবে ছাগশাবক কাকদন্তির হিসাব পর্য্যন্ত মিলাইয়া দিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের পতন কে গণনা করিবে?

"জন্তুদের জীবনের পরিসর সঙ্কীর্ণ, তাহারা অল্পদূর গিয়াই উন্নতি

শেষ করে—এই জন্য আরম্ভ কাল হইতেই তাহারা শক্ত সমর্থ। মানুষের জীবনের পরিধি বহুবিস্তীর্ণ, এই জন্য বহুকাল পর্য্যন্ত সে অপরিণত দুর্ব্বল।

জন্তুরা যে স্বাভাবিক নৈপুণ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে ইংরাজিতে তাহাকে বলে ইনষ্টিংক্ট্, বাংলায় তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সহজ-সংস্কার। সহজ-সংস্কার অশিক্ষিত-পটুত্ব একেবারেই ঠিক পথ দিয়া চলিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি ইতস্তত করিতে করিতে ভ্রমের মধ্য দিয়া আপনার পথ সন্ধান করিয়া বাহির করে। সহজ-সংস্কার পশুদের, বুদ্ধি মানুষের। সহজ-সংস্কারের গম্যস্থান সামান্য সীমার মধ্যে, বুদ্ধির শেষ লক্ষ্য এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

আমরা মানব সন্তান বলিয়াই বহুকাল আমাদের শারীরিক মানসিক দুর্ব্বলতা; বহুকাল আমরা পড়ি, বহুকাল আমরা ভুলি, বহুকাল আমাদিগের শিক্ষা করিতে যায়,—আমরা অনন্তের সন্তান বলিয়া বহুকাল ধরিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা, পদে পদে আমাদের দুঃখ, কষ্ট, পতন। কিন্তু সেই আমাদের সৌভাগ্য, সেই আমাদের চিরজীবনের লক্ষণ, তাহাতেই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে এখনও আমাদের বুদ্ধি ও বিকাশের শেষ হইয়া যায় নাই।

শৈশবেই যদি মানুষের উপসংহার হইত, তাহা হইলে মানুষের মত অপরিস্ফুটতা সমস্ত প্রাণীসংসারে কোথাও পাওয়া যাইত না, অপরিণত পদস্খলিত ইহজীবনেই যদি আমাদের পরিসমাপ্তি হয় তবে আমরা একান্ত দুর্ব্বল ও হীন তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বিলম্ববিকাশ, আমাদের ত্রুটি, আমাদের পাপ আমাদের সম্মুখবর্ত্তী সুদূর ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে। বলিয়া দিতেছে, কড়া, ক্রান্তি, কাক, দন্তি চোখ-বাঁধা ঘানির বলদের জন্য; সে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের পদচিহ্নিত একটি ক্ষুদ্র সুগোলচক্রের মধ্যে প্রতিদিন পাক খাইয়া সর্ষপ হইতে তৈল

নিষ্পেষণ নামক একটি বিশেষ-নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহার প্রতি মুহূর্ত্ত এবং প্রতি তৈলবিন্দু হিসাবের মধ্যে আনা যায়—কিন্তু যাহাকে আপনার সমস্ত মনুষ্যত্ব অপরিমেয় বিকাশের দিকে লইয়া যাইতে হইবে তাহাকে বিস্তর খুচরা হিসাব ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে।

উপসংহারে একটি কথা বলিয়া রাখি, একিলিস্ এবং কচ্ছপ নামক একটি ন্যায়ের কুতর্ক আছে। তদ্দ্বারা প্রমাণ হয় যে, একিলিস যতই দ্রুতগামী হউক মন্দগতি কচ্ছপ যদি একত্রে চলিবার সময় কিঞ্চিন্মাত্র অগ্রসর থাকে তবে একিলিস তাহাকে ধরিতে পারিবে না। এই কুতর্কে তার্কিক অসীম ভগ্নাংশের হিসাব ধরিয়াছেন—কড়াক্রান্তি, দন্তিকাকের দ্বারা তিনি ঘরে বসিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, কচ্ছপ চিরদিন অগ্রবর্ত্তী থাকিবে। কিন্তু এদিকে প্রকৃত কর্ম্মভূমিতে একিলিস এক পদক্ষেপে সমস্ত কড়াক্রান্তি, দন্তিকাক লঙ্ঘন করিয়া কচ্ছপকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

১২৯৯

সমুদ্রযাত্রা

বাংলা দেশে সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন প্রায় সমুদ্র-আন্দোলনের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংবাদপত্র এবং চটি পুঁথি বাক্যোচ্ছ্বাসে ফেনিল ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে—পরস্পর আঘাত প্রতিঘাতেরও শেষ নাই।

তর্কটা এই লইয়া যে, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রসিদ্ধ, না শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সমুদ্রযাত্রা ভাল কি মন্দ তাঁহা লইয়া কোনো কথা নহে। কারণ যাহা অন্যহিসাবে ভাল অথবা যাহাতে কোনো মন্দর সংস্রব দেখা যায় না, তাহা যে শাস্ত্রমতে ভাল না হইতে পারে একথা স্বীকার করিতে আমাদের কোনো লজ্জা নাই।

(যাহাতে আমাদের মঙ্গল, আমাদের শাস্ত্রের বিধানও তাহাই একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তাহা যদি পারিতাম, তবে সেই মঙ্গলের দিক হইতে যুক্তি আকর্ষণ করিয়া শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দিতাম। আগে দেখাইতাম অমুক কার্য্য আমাদের পক্ষে ভাল এবং অবশেষে দেখাইতাম তাহাতে আমাদের শাস্ত্রের সম্মতি আছে।)

সমুদ্রযাত্রার উপকারিতার পক্ষে ভূরি ভূরি প্রমাণ থাক্ না কেন, যদি শাস্ত্রে তাহার বিরুদ্ধে একটিমাত্র বচন থাকে, তবে সমস্ত প্রমাণ ব্যর্থ হইবে। তাহার অর্থ এই, আমাদের কাছে সত্যের অপেক্ষা বচন বড়, মানবের শাস্ত্রের নিকট জগদীশ্বরের শাস্ত্র ব্যর্থ।

শাস্ত্রই যে সকলসময়ে বলবান তাহাও নহে। অনেকে বলেন বটে, ঋষিদের এমন অমানুষিক বুদ্ধি ছিল যে, তাঁহারা যে-সকল বিধান দিয়াছেন, সমস্ত প্রমাণ তুচ্ছ করিয়া আমরা অন্ধবিশ্বাসের সহিত নির্ভয়ে তাহা পালন করিয়া যাইতে পারি। কিন্তু সমাজে অনেক সময়েই শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য তাঁহারা লঙ্ঘন করেন এবং তখন লোকাচার ও দেশাচারের দোহাই দিয়া থাকেন।

তাহাতে এই প্রমাণ হয় যে, শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য অভ্রান্ত নহে। যদি অভ্রান্ত হইত, তবে লোকাচার তাহার কোনোরূপ অন্যথা করিলে লোকাচারকে দোষী করা উচিত হইত। কিন্তু দেশাচার ও লোকাচারের প্রতি যদি শাস্ত্রবিধি-সংশোধনের ভার দেওয়া যায়, তবে শাস্ত্রের

অমোঘতা আর থাকে না—তবে স্পষ্ট মানিতে হয়, শাস্ত্রশাসন সকল কালে সকল স্থানে খাটে না।

তাহা যদি না খাটিল, তবে আমাদের কর্ত্তব্যের নিয়ামক কে? শুভবুদ্ধিও নহে, শাস্ত্রবাক্যও নহে। লোকাচার। কিন্তু লোকাচারকে কে পথ দেখাইবে? লোকাচার যে অভ্রান্ত নহে, ইতিহাসে তাহার শতসহস্র প্রমাণ আছে। লোকাচার যদি অভ্রান্ত হইত, তবে পৃথিবীতে এত বিপ্লব ঘটিত না, এত সংস্কারকের অভ্যুদয় হইত না।

বিশেষত যে লোকসমাজের মধ্যে জীবনপ্রবাহ নাই সেখানকার জড় লোকাচার আপনাকে আপনি সংশোধন করিতে পারে না। স্রোতের জল অবিশ্রাম গতিবেগে নিজের দূষিত অংশ ক্রমাগত পরিহার করিতে থাকে। কিন্তু বদ্ধ জলে দোষ প্রবেশ করিলে তাহা সংশোধিত হইতে পারে না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আমাদের সমাজ বদ্ধ সমাজ। একে ত আভ্যন্তরিক সহস্র আইনে বদ্ধ, তাহার পরে আবার ইংরাজের আইনেও বাহির হইতে অষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন পড়িয়া গেছে। সমাজ-সংশোধনে স্বদেশীয় রাজার স্বাভাবিক অধিকার ছিল এবং পূর্ব্বকালে তাঁহারা সে-কাজ করিতেন। কিন্তু অনধিকারী ইংরাজ আমাদের সমাজকে যে অবস্থায় হাতে পাইয়াছে ঠিক সেই অবস্থায় দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সে নিজেও কোনো নূতন নিয়ম প্রচলিত করিতে সাহস করে না, বাহির হইতেও কোনো নূতন নিয়মকে প্রবেশ করিতে দেয় না। কোনটা বৈধ, কোনটা অবৈধ তাহা সে অন্ধভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। এখন সমাজের কোনো সচেতন স্বাভাবিক শক্তি সহজে কোনোরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না।

এমন বাঁধা-সমাজের মধ্যে যদি লোকাচার মানিতে হয়, তবে একটা মৃত দেবতার পূজা করিতে হয়। সে কেবল একটা নিশ্চল

নিশ্চেষ্ট জড়-কঙ্কাল। সে চিন্তা করে না, অনুভব করে না; সময়ের পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার দক্ষিণে বামে নড়িবার শক্তি নাই। সমস্ত হতভাগ্য জাতি, তাহার সমস্ত ভক্ত উপাসক, যদি তাহার সম্মুখে পড়িয়া পলে পলে আপনার মরণব্রত উদ্‌যাপন করে, তথাপি সে কল্যাণ-পথে তিলার্দ্ধমাত্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

(যাহারা শাস্ত্র হইতে বিধি সংগ্রহ করিয়া লোকাচারকে আঘাত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা কি করেন? তাঁহারা মৃতকে মারিতে চাহেন। যাহার বেদনাবোধ নাই তাহার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করেন, যে অন্ধ, তাহার নিকট দীপশিখা আনয়ন করেন। অস্ত্র প্রতিহত হয়, দীপশিখা বৃথা আলোকদান করে।)

তাঁহাদের আর একটা কথা জানা উচিত। শাস্ত্রও এক সময়ের লোকাচার। তাঁহারা অন্যসময়ের লোকাচারকে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া বর্ত্তমানকালের লোকাচারকে আক্রমণ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন, বহুপ্রাচীনকালে সমুদ্রযাত্রার কোনো বাধা ছিল না। বর্ত্তমান লোকাচার বলে, তখন ছিল না এখন আছে, ইহার কোনো উত্তর নাই।

এ যেন এক শত্রুকে তাড়াইবার উদ্দেশে আর এক শত্রুকে ডাকা। মোগলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পাঠানের হাতে আত্মসমর্পণ করা। যাহার নিজের কিছুমাত্র শক্তি আছে সে এমন বিপদের খেলা খেলিতে চাহে না।

(আমাদের কি নিজের কোনো শক্তি নাই? আমাদের সমাজে যদি কোনো দোষের সঞ্চার হয়, যদি তাহার কোনো ব্যবস্থা আমাদের সমস্ত জাতির উন্নতি-পথের ব্যাঘাতস্বরূপ আপন পাষাণ-মস্তক উত্তোলন করিয়া থাকে, তবে তাহা দূর করিতে গেলে আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, বহু প্রাচীনকালে তাহার কোনো নিষেধ-বিধি ছিল কি না? যদি দৈবাৎ পাওয়া গেল, তবে দিনকতক পণ্ডিতে পণ্ডিতে শাস্ত্রে

শাস্ত্রে দেশব্যাপী একটা লাঠালাঠি পড়িয়া গেল—আর যদি দৈবাৎ অনুস্বর বিসর্গবিশিষ্ট একটা বচনাৰ্দ্ধ না পাওয়া গেল, তবে আমরা কি এমনই নিরুপায় যে, সমাজের সমস্ত অসম্পূর্ণতা সমস্ত দোষ শিরোধার্য্য করিয়া বহন করিব, এমন কি, তাহাকে পবিত্র বলিয়া পূজা করিব? দোষও কি প্রাচীন হইলে পূজ্য হয়?)

আমরা কি নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধির বলে মাথা তুলিয়া বলিতে পারি না—পূর্ব্বে কি ছিল এবং এখন কি আছে তাহা জানিতে চাহি না, সমাজের যাহা দোষ তাহা দূর করিব, যাহা মঙ্গল তাহা আবাহন করিয়া আনিব? আমাদের শুভাশুভ জ্ঞানকে হস্তপদ ছেদন করিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়া দিব, আর একটা গুরুতর আবশ্যক পড়িলে, দেশের একটা মহৎ অনিষ্ট, একটা বৃদ্ধ অকল্যাণ দূর করিতে হইলে, সমস্ত পুরাণ সংহিতা আগম নিগম হইতে বচনখণ্ড খুঁজিয়া খুঁজিয়া উদ্ভ্রান্ত হইতে হইবে—সমাজের হিতাহিত লইয়া বয়স্ক লোকের মধ্যে এরূপ বাল্যখেলা আর কোনো দেশে প্রচলিত আছে কি?

আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, যে লোকাচারকে তাহার স্থলে অভিষিক্ত করিয়াছি, সে আবার এমনি মূঢ় অন্ধ যে, সে নিজের নিয়মেরও সঙ্গতি রক্ষা করিতে জানে না। কত হিন্দু যবনের জাহাজে চড়িয়া উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, সিংহল ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে—তাহাদের জাতি লইয়া কোনো কথা উঠিতেছে না, এদিকে সমুদ্রযাত্রা বিধিসঙ্গত নহে বলিয়া লোকসমাজ চীৎকার করিয়া মরিতেছে। দেশে শত শত লোক অখাদ্য ও যবনান্ন খাইয়া মানুষ হইয়া উঠিল, প্রকাশ্যে যবনের প্রস্তুত মদ্যপান করিতেছে, কেহ সেদিকে একবার তাকায়ও না, কিন্তু বিলাতে গিয়া পাছে অনাচার ঘটে এজন্য বড় শঙ্কিত! কিন্তু যুক্তি নিষ্ফল। যাহার চক্ষু আছে তাহার নিকট এ-সকল কথা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার আবশ্যক ছিল না। কিন্তু লোকাচার নামক

প্রকাণ্ড জড় পুত্তলিকার মস্তকের অভ্যন্তরে ত মস্তিষ্ক নাই, সে একটা নিশ্চল পাষাণপাত্র। কাককে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত গৃহস্থ হাঁড়ি চিত্রিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে খাড়া করিয়া রাখে, লোকাচার সেইরূপ চিত্রিত বিভীষিকা। যে তাহার জড়ত্ব জানে সে তাহাকে ঘৃণা করে, যে তাহাকে ভয় করে তাহার কর্তব্যবুদ্ধি লোপ পায়।

আজকাল অনেক পুস্তক ও পত্রে আমাদের বর্তমান লোকাচারের অসঙ্গতি দোষ দেখান হয়। বলা হয়, একদিকে আমরা বাধ্য হইয়া অথবা অন্ধ হইয়া কত অনাচার করি, অন্যদিকে সামান্য আচার বিচার লইয়া কত কড়াক্কড়! কিন্তু হাসি পায় যখন ভাবিয়া দেখি, কাহাকে সে কথাগুলা বলা হইতেছে! শিশুরা পুত্তলিকার সঙ্গেও এমনি করিয়া কথা কয়। কে বলে লোকাচার যুক্তি অথবা শাস্ত্র মানিয়া চলে? সে নিজেও এমন মহা অপবাদ স্বীকার করে না। তবে তাহাকে যুক্তির কথা কেন বলি?

সমাজের মধ্যে যে কোনো পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা বিনা যুক্তিতেই সাধিত হইয়াছে। গুরুগোবিন্দ, চৈতন্য যখন এই জাতিনিগড়বদ্ধ দেশে জাতিভেদ কথঞ্চিৎ শিথিল করেন তখন তাহা যুক্তিবলে করেন নাই, চরিত্রবলে করিয়াছিলেন।

আমাদের যদি এরূপ মত হয় যে সমুদ্রযাত্রার উপকার আছে, [illegible] যে নিষেধ বিনা কারণে ভারতবর্ষীয়দিগকে চিরকালের জন্য কেবল পৃথিবীর একাংশেই বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে, সেই কারাদণ্ডবিধান নিতান্ত অন্যায় ও অনিষ্টজনক, দেশে বিদেশে গিয়া জ্ঞান অর্জন ও উন্নতিসাধন হইতে কোনো প্রাচীন বিধি আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না, যিনি আমাদিগকে এই সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণের অধিকার দিয়াছেন —তবে আমরা আর কিছু শুনিতে চাহি না, তবে কোনো শ্লোকখণ্ড

আমাদিগকে ভয় দেখাইতে, কোনো লোকাচার আমাদিগকে নিষেধ করিতে পারে না।

বাধও ভাঙ্গিয়াছে। কেহ শাস্ত্র ও লোকাচারের মুখ চাহিয়া বসিয়া নাই। বঙ্গগৃহ হইতে সন্তানগণ দলে দলে সমুদ্রপার হইতেছে। এবং ক্ষীণবল সমাজ তাহার কোনো প্রতিবিধান করিতে পারিতেছে না। সমাজের প্রধান বল নীতিবল যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে বেশিদিন কেহ ভয় করিবে না। যে সমাজ মিথ্যাকে, কপটতাকে মার্জ্জনা করে, অদ্ধগুপ্ত অনাচারের প্রতি জানিয়া শুনিয়া চক্ষু নিমীলন করে, যাহার নিয়মের মধ্যে কোনো নৈতিক কারণ, কোনো যৌক্তিক সঙ্গতি নাই, সে যে নিতান্ত দুর্ব্বল। সমাজের সমস্ত বিশ্বাস যদি দৃঢ় হইত, যদি সেই অখণ্ড বিশ্বাস অনুসারে সে নিজের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নিয়মিত করিত, তবে তাহাকে লঙ্ঘন করা বড় দুরূহ হইত।

যাঁহারা শুভ বুদ্ধির প্রতি নির্ভর না করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সমুদ্রযাত্রা করিতে চান, তাঁহারা দুর্ব্বল। কারণ, তাঁহাদের পক্ষে কোনো যুক্তি নাই—সমাজ শাস্ত্রমতে চলে না।

দ্বিতীয় কথা এই, লোকাচার যে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে তাহার একটা অর্থ আছে। হিন্দুসমাজের অনেকগুলি নিয়ম পরস্পর দৃঢ়সম্বদ্ধ। একটা ভাঙ্গিতে গেলে আর একটা ভাঙ্গিয়া পড়ে। রীতিমত স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিতে গেলে বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিতে হয়। বাল্যবিবাহ গেলে ক্রমশই স্বাধীনবিবাহ আসিয়া পড়ে। স্বাধীনবিবাহ প্রচলিত করিতে গেলে সমাজের বিস্তর রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে এবং জাতিভেদের মূল ক্রমে জীর্ণ হইয়া আসে। কিন্তু তাই বলিয়া এখন স্ত্রীশিক্ষা কে বন্ধ করিতে পারে?

সমুদ্রপার হইয়া বিদেশযাত্রাও আমাদের বর্ত্তমান সমাজ রক্ষার

পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। আমাদের সমাজে কোনো প্রকার স্বাধীনতার কোনো অবসর নাই। আমরা নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল, অন্ধভাবে সমাজের অন্ধকূপে এক অবস্থায় পড়িয়া থাকিব, লোকাচারের এই বিধান। (মৃত্যুর ন্যায় শান্ত অবস্থা আর নাই, সেই অগাধ শান্তি লাভ করিবার জন্য যতদূর সম্ভব আমাদের জীবনীশক্তি লোপ করা হইয়াছে। একটি সমগ্র বৃহৎ জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও নিজ্জীব করিয়া ফেলিতে অল্প আয়োজন করিতে হয় নাই। কারণ, মনুষ্যত্বের অভ্যন্তরে একটি অমর জীবনের বীজ নিহিত আছে যে, সে যদি কোনো ছিদ্র দিয়া একটুখানি স্বাধীন সূর্য্যালোক ও বৃষ্টিধারা প্রাপ্ত হয়, অমনি অঙ্কুরিত, পল্লবিত, বিকশিত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। সেই ভয়ে আমাদের হিন্দুসমাজ কোথাও কোনো ছিদ্র রাখিতে চাহে না।

সমুদ্রপার হইয়া নূতন দেশে নূতন সভ্যতার নূতন নূতন আদর্শলাভ করিয়া আমাদের মনের মধ্যে চিন্তার বন্ধন মুক্তি হইবে তাহার সন্দেহ নাই। সে-সমস্ত নিয়ম আমরা বিনা সংশয়ে আজন্মকাল পালন করিয়া আসিয়াছি, কখনও কারণ জিজ্ঞাসাও মনে উদয় হয় নাই, সে-সম্বন্ধে নানা যুক্তি তর্ক ও সন্দেহের উদ্ভব হইবে। সেই মানসিক আন্দোলনই হিন্দসমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ। বাহ্যত ম্লেচ্ছ-সংসর্গ ও সমুদ্রপার হওয়া কিছুই নহে কিন্তু সেই অন্তরের মধ্যে স্বাধীন মনুষ্যত্বের সঞ্চার হওয়াই যথার্থ লোকাচার-বিরুদ্ধ।

কিন্তু হায়! আমরা সমুদ্রপার না হইলেও মনুর সংহিতা অন্য জাতিকে সমুদ্রপার হইতে নিষেধ করিতে পারে নাই। নূতন জ্ঞান, নূতন আদর্শ, নূতন সন্দেহ, নূতন বিশ্বাস জাহাজবোঝাই হইয়া এদেশে আসিয়া পৌঁছিতেছে। আমাদের যে গোড়াতেই ভ্রম। সমাজরক্ষার জন্য যদি আমাদের এত ভয়, এত ভাবনা, তবে গোড়ায় ইংরাজি শিক্ষা হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করা উচিত ছিল। পর্ব্বতকে যদি

মহম্মদের নিকট যাইতে নিষেধ কর, মহম্মদ যে পর্ব্বতের কাছে আসে, তাহার উপায় কি? আমরা যেন ইংলণ্ডে না গেলাম কিন্তু ইংরাজি শিক্ষা যে আমাদের গৃহে গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। বাঁধটা সেই ত ভাঙ্গিয়াছে। আজ যে এত বাক্‌চাতুরী, এত শাস্ত্র-সন্ধানের ধূম পড়িয়াছে, মনে আঘাত না পড়িলে ত তাহার কোনো আবশ্যক ছিল না।

কিন্তু মূঢ় লোকাচার এমনি অন্ধ অথবা এমনি কপটাচারী যে, সে-দিকে কোনো দৃক্‌পাত নাই। অতি বড় পবিত্র হিন্দুও শৈশব হইতে আপন পুত্রকে ইংরাজি শিখাইতেছে। এমন কি মাতৃভাষা শিখাইতেছে না। এবং শিক্ষাসমিতি-সভায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃ-ভাষাশিক্ষার প্রস্তাব উঠিতেছে তখন স্বদেশের লোকই ত তাহাতে প্রধান আপত্তি করিতেছে।

কেরাণীগিরি না করিলে যে উদরপূর্ণ হয় না। পাশ করিতেই হইবে। পাশ না করিলে চাকরী চুলায় যাক, বিবাহ করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। ইংরাজি শিক্ষার মর্য্যাদা দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে এমনি বদ্ধমূল হইয়াছে।

কিন্তু এ কি ভ্রম, এ কি দুরাশা! ইংরাজি শিক্ষাতে কেবলমাত্র যতটুকু কেরাণীগিরির সহায়তা করিবে ততটুকু আমরা গ্রহণ করিব, বাকীটুকু—আমাদের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিবে না! এ কি কখনো সম্ভব হয়। দীপশিখা কেবল যে আলো দেয় তাহা নহে, পলিতাটুকুও পোড়ায়, তেলটুকুও শেষ করে। ইংরাজিশিক্ষা কেবল যে মোটামোটা চাক্‌রি দেয় তাহা নহে, আমাদের লোকাচারের আবহমান সূত্রগুলিকেও পলে পলে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

এখন যতদিন এই শিক্ষা চলিবে এবং ইহার উপর আমাদের জীবিকানির্ব্বাহ নির্ভর করিবে, ততদিন যিনি যেমন তর্ক করুন, শাস্ত্র

মৃতভাষায় যতই নিষেধ ও বিভীষিকা প্রচার করুক, বাঙালী সমুদ্র পার হইবে, পৃথিবী সমস্ত উন্নতিপথের যাত্রীদের সঙ্গ ধরিয়া একত্রে যাত্রা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

১২৯৯

বিলাসের ফাঁস

ইংরেজ আত্মপরিতৃপ্তির জন্য পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি খরচ করিতেছে, ইহা লইয়া ইংরেজি কাগজে আলোচনা দেখা যাইতেছে। একথা তাহাদের অনেকেই বলিতেছে যে, বেতনের ও মজুরির হার আজকাল উচ্চতর হইলেও তাহাদের জীবনযাত্রা এখনকার দিনে পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী দুরূহ হইয়াছে। কেবল যে তাহাদের ভোগস্পৃহা বাড়িয়াছে তাহা নহে, আড়ম্বরপ্রিয়তাও অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেবলমাত্র ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষের অধিক লোক দেনা শোধ করিতে না পারায় আদালতে হাজির হয়। এই সকল দেনার অধিকাংশই আড়ম্বরের ফল। পূর্ব্বে অল্প আয়ের লোকে সাজে সজ্জায় যত বেশি খরচ করিত, এখন তাহার চেয়ে অনেক বেশি করে। বিশেষত মেয়েদের পোষাকের দেনা শোধ করিতে গৃহস্থ ফতুর হইতেছে। যে স্ত্রীলোক মুদির দোকানে কাজ করে, ছুটীর দিনে তাহার কাপড় দেখিয়া তাহাকে আমীর ঘরের মেয়ে বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, এমন ঘটনা দুর্লভ নহে। বৃহৎ ভূসম্পত্তি হইতে যে-সকল ড্যুকের বিপুল আয়

আছে, বহুব্যয়সাধ্য নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে তাহাদেরও টানাটানি পড়িয়াছে—যাহাদের অল্প আয়, তাহাদের ত কথাই নাই। ইহাতে লোকের বিবাহে অপ্রবৃত্তি হইয়া তাহার বহুবিধ কুফল ফলিতেছে।

এই ভোগ এবং আড়ম্বরের ঢেউ আমাদের দেশেও যে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, সে-কথা কাহারো অগোচর নহে। অথচ আমাদের দেশে আয়ের পথ বিলাতের অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ। শুধু তাই নয়। দেশের উন্নতির উদ্দেশে যে-সকল আয়োজনের আবশ্যক আছে, অর্থাভাবে আমাদের দেশে তাহা সমস্তই অসম্পূর্ণ।

আড়ম্বরের একটা উদ্দেশ্য লোকের কাছে বাহবা পাওয়া। এই বাহবা পাইবার প্রবৃত্তি এখনকার চেয়ে পূর্ব্বকালে অল্প ছিল, সে-কথা মানিতে পারি না। তখনও লোকসমাজে খ্যাত হইবার ইচ্ছা নিঃসন্দেহ এখনকার মতই প্রবল ছিল। তবে প্রভেদ এই—তখন খ্যাতির পথ একদিকে ছিল, এখন খ্যাতির পথ অন্যদিকে হইয়াছে।

তখনকার দিনে দানধ্যান, ক্রিয়াকর্ম্ম, পূজাপার্ব্বণ ও পূর্ত্তকার্য্যে ধনী ব্যক্তিরা খ্যাতিলাভ করিতেন। এই খ্যাতির প্রলোভনে নিজের সাধ্যাতিরিক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ নিঃস্ব হইয়াছেন এমন ঘটনা শুনা গেছে।

কিন্তু, এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যে আড়ম্বরের গতি নিজের ভোগলালসা তৃপ্তির দিকে নহে, তাহা সাধারণত নিতান্ত অসংযত হইয়া উঠে না, এবং তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে ভোগের আদর্শকে বাড়াইয়া তুলিয়া চতুর্দ্দিকে বিলাসের মহামারী সৃষ্টি করে না। মনে কর, যে ধনীর গৃহে নিত্য অতিথিসেবা ছিল, তাঁহার এই সেবার ব্যয় যতই বেশী হউক্ না অতিথিরা যে আহার পাইতেন তাহাতে বিলাসিতার চর্চ্চা হইত না। বিবাহাদি কর্ম্মে রবাহূত অনাহূতদের নিষেধ ছিল না বটে, কিন্তু তাহার ফলে যজ্ঞের আয়োজন বৃহৎ

হইলেও যথেষ্ট সরল হইত। ইহাতে সাধারণ লোকের চাল চলন বাড়িয়া যাইত না।

এখনকার দিনে ব্যক্তিগত ভোগের আদর্শ বাড়িয়া উঠিয়াছে, এই জন্য বাহবার স্রোত সেই মুখেই ফিরিয়াছে। এখন আহার পরিচ্ছদ, বাড় গাড়ি জুড়ি, আসবাবপত্রদ্বারা লোকে আপন মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। ধনীতে ধনীতে এখন এই লইয়া প্রতিযোগিতা। ইহাতে যে কেবল তাহাদের চাল বাড়িয়া যাইতেছে তাহা নহে, যাহারা অশক্ত তাহাদেরও বাড়িতেছে। আমাদের দেশে ইহাতে যে কতদূর পর্য্যন্ত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে, তাহা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কারণ, আমাদের সমাজের গঠন এখনো বদলায় নাই। এ সমাজ বহুসম্বন্ধ-বিশিষ্ট। দূর নিকট, স্বজন পরিজন, অনুচর পরিচর, কাহাকেও এ সমাজ অস্বীকার করে না। অতএব এ সমাজের ক্রিয়াকর্ম্ম বৃহৎ হইতে গেলেই সরল হওয়া অত্যাবশ্যক। না হইলে মানুষের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ পর্য্যন্ত আমাদের সামাজিক কর্ম্মে এই সরলতা ও বিপুলতার সামঞ্জস্য ছিল, এখন সাধারণের চাল চলন বাড়িয়া গেছে অথচ এখন আমাদের সমাজের পরিধি সে পরিমাণে সঙ্কুচিত হয় নাই, এই জন্য সাধারণ লোকের সমাজকৃত্য দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমি জানি, এক ব্যক্তি ত্রিশ টাকা বেতনে কর্ম্ম করে। তাহার পিতার মৃত্যু হইলে পর পিতৃবিয়োগের অপেক্ষা শ্রাদ্ধের ভাবনা তাহাকে অধিক পীড়িত করিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার আয়ের অনুপাতে তোমার সাধ্য অনুসারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর না কেন?" সে বলিল, তাহার কোনো উপায় নাই—গ্রামের লোক ও আত্মীয় কুটুম্বমণ্ডলীকে না খাওয়াইলে তাহার বিপদ্ ঘটিবে। এই দরিদ্রের প্রতি সমাজের দাবী সম্পূর্ণই রহিয়াছে অথচ সমাজের ক্ষুধা বাড়িয়া গেছে! পূর্ব্বে যেরূপ আয়োজনে সাধারণের তৃপ্তি হইত এখন আর তাহা হয় না।

যাঁহারা ক্ষমতাশালী ধনী লোক, তাঁহারা সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারেন। তাঁহারা সহরে আসিয়া কেবলমাত্র বন্ধুমণ্ডলীকে লইয়া সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন নহেন, তাঁহাদের পলাইবার পথ নাই।

আমরা বীরভূম জেলায় একজন কৃষী গৃহস্থের বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিলাম। গৃহস্বামী তাহার ছেলেকে চাকরী দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করাতে আমি বলিলাম—"কেনরে ছেলেকে চাষবাস ছাড়াইয়া পরের অধীন করিবার চেষ্টা করিস্ কেন?" সে কহিল—"বাবু, একদিন ছিল যখন জমী জমা লইয়া আমরা সুখেই ছিলাম। এখন শুধু জমি জমা হইতে আর দিন চলিবার উপায় নাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন বল্‌ত?" সে উত্তর করিল,—"আমাদের চাল্ বাড়িয়া গেছে। পূর্ব্বে বাড়িতে কুটুম্ব আসিলে চিঁড়া গুড়েই সন্তুষ্ট হইত, এখন সন্দেশ না পাইলে নিন্দা করে। আমরা শীতের দিনে দোলাই গায়ে দিয়া কাটাইয়াছি, এখন ছেলেরা বিলাতি র‍্যাপার না পাইলে মুখ ভারি করে। আমরা জুতা পায়ে না দিয়াই শ্বশুরবাড়ি গেছি। ছেলেরা বিলাতী জুতা না পরিলে লজ্জায় মাথা হেঁট করে। তাই চাষ করিয়া আর চাষার চলে না।"

কেহ কেহ বলিবেন, এ-সমস্ত ভাল লক্ষণ; অভাবের তাড়নায় মানুষকে সচেষ্ট করিয়া তোলে। ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিকাশের উত্তেজনা জন্মে। কেহ কেহ এমনও বলিবেন, বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট সমাজ ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া নষ্ট করে। অভাবের দায়ে এই সমাজের বহুবন্ধনপাশ শিথিল হইয়া গেলে মানুষ স্বাধীন হইবে। ইহাতে দেশের মঙ্গল।

এ সমস্ত তর্কের মীমাংসা সংক্ষেপে হইবার নহে। য়ুরোপে ভোগের তাগিদ দিয়া অনেকগুলি লোককে মারিয়া কতকগুলি লোককে ক্ষমতাশালী করিয়া তোলে। হিন্দু সমাজতন্ত্রে কতকগুলি লোককে

অনেকগুলি লোকের জন্য ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া সমাজকে ক্ষমতাশালী করিয়া রাখে, এই উভয় পন্থাতেই ভাল মন্দ দুইই আছে। য়ুরোপীয় পন্থাই যদি একমাত্র শ্রেয় বলিয়া সপ্রমাণ হইত, তাহা হইলে এ বিষয়ে কোনো কথাই ছিল না। য়ুরোপের মনীষিগণের কথায় অবধান করিলে জানা যায় যে, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ আছে।

যেমন করিয়া হোক্, আমাদের হিন্দুসমাজের সমস্ত গ্রন্থি যদি শিথিল হইয়া যায়, তবে ইহা নিশ্চয় যে, বহু সহস্র বৎসরে হিন্দুজাতি যে অটল আশ্রয়ে বহু ঝড় ঝঞ্ঝা কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার স্থানে নূতন আর কিছু গড়িয়া উঠিবে কি না, উঠিলেও তাহা আমাদিগকে কিরূপ নির্ভর দিতে পারিবে, তাহা আমরা জানি না। এমন স্থলে আমাদের যাহা আছে, নিশ্চিন্তমনে তাহার বিনাশদশা দেখিতে পারিব না।

মুসলমানের আমলে হিন্দুসমাজের যে কোনো ক্ষতি হয় নাই, তাহার কারণ সে আমলে ভারতবর্ষের আর্থিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের টাকা ভারতবর্ষেই থাকিত, বাহিরের দিকে তাহার টান না পড়াতে আমাদের অন্নের স্বচ্ছলতা ছিল। এই কারণ আমাদের সমাজ-ব্যবহার সহজেই বহুব্যাপক ছিল। তখন ধনোপার্জ্জন আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তাকে এমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই। তখন সমাজে ধনের মর্য্যাদা অধিক ছিল না এবং ধনই সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা বলিয়া গণ্য ছিল না। ধনশালী বৈশ্যগণ যে সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহাও নহে। এই কারণে, ধনকে শ্রেষ্ঠ আসন দিলে জনসাধারণের মনে যে হীনতা আসে, আমাদের দেশে তাহা ছিল না।

এখন টাকাসম্বন্ধে সমাজস্থ সকলেই অত্যন্ত বেশি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য আমাদের সমাজেও এমন একটা দীনতা আসিয়াছে যে, টাকা নাই ইহাই স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সকলের

চেয়ে লজ্জাকর হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে ধনাড়ম্বরের প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে, লোকে ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করে, সকলেই প্রমাণ করিতে বসে যে, আমি ধনী। বণিক্‌জাতি রাজসিংহাসনে বসিয়া আমাদিগকে এই ধনদাসত্বের দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিয়াছে।

মুসলমানসমাজে বিলাসিতা যথেষ্ট ছিল এবং তাহা হিন্দুসমাজকে যে একেবারে স্পর্শ করে নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বিলাসিতা সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয় নাই। তখনকার দিনে বিলাসিতাকে নবাবী বলিত। অল্প লোকেরই সেই নবাবী চাল ছিল। এখনকার দিনে বিলাসিতাকে বাবুগিরি বলে ; দেশে বাবুর অভাব নাই।

এই বাবুয়ানার প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠায় আমরা যে কতদিক্ হইতে কত দুঃখ পাইতেছি, তাহার সীমা নাই। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেখ। একদিকে আমাদের সমাজবিধানে কন্যাকে একটা বিশেষ বয়সে বিবাহ দিতে সকলে বাধ্য, অন্যদিকে পূর্ব্বের ন্যায় নিশ্চিন্ত-চিত্তে বিবাহ করা চলে না। গৃহস্থজীবনের ভারবহন করিতে যুবকগণ সহজেই শঙ্কা বোধ করে। এমন অবস্থায় কন্যার বিবাহ দিতে হইলে পাত্রকে যে পণ দিয়া ভুলাইতে হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? পণের পরিমাণও জীবনযাত্রার বর্ত্তমান আদর্শ অনুসারে যে বাড়িয়া যাইবে, ইহাতেও আশ্চর্য্য নাই। এই পণ লওয়া প্রথার বিরুদ্ধে আজ-কাল অনেক আলোচনা চলিতেছে ; বস্তুত ইহাতে বাঙালী গৃহস্থের দুঃখ যে অত্যন্ত বাড়িয়াছে তাহাতেও সন্দেহ মাত্র নাই—কন্যার বিবাহ লইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া নাই এমন কন্যার পিতা আজ বাংলাদেশে অল্পই আছে। অথচ, এজন্য আমাদের বর্ত্তমান সাধারণ অবস্থা ছাড়া ব্যক্তিবিশেষকে দোষ দেওয়া যায় না। একদিকে ভোগের আদর্শ উচ্চ হইয়া সংসার-যাত্রা বহুব্যয়সাধ্য ও অপর দিকে কন্যামাত্রকেই নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিবাহ দিতে বাধ্য হইলে পাত্রের আর্থিক মূল্য না বাড়িয়া গিয়া থাকিতে

পারে না। অথচ এমন লজ্জাকর ও অপমানকর প্রথা আর নাই। জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারী দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয় শ্রেণীতে গণ্য হইবে আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে নির্ম্মমভাবে দরদাম করিতে থাকা—এমন দুঃসহ নীচতা যে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে সমাজের কল্যাণ নাই, সে সমাজ নিশ্চয়ই নষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। (যাঁহারা এই অমঙ্গল দূর করিতে চান তাঁহারা ইহার মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া যদি ডাল ছাঁটিবার চেষ্টা করেন তবে লাভ কি?) প্রত্যেকে জীবনযাত্রাকে সরল করুন, সংসারভারকে লঘু করুন, ভোগের আড়ম্বরকে খর্ব্ব করুন, তবেই লোকের পক্ষে গৃহী হওয়া সহজ হইবে, টাকার অভাব ও টাকার আকাঙ্ক্ষাই সর্ব্বোচ্চ হইয়া উঠিয়া মানুষকে এতদূর পর্য্যন্ত নির্লজ্জ করিবে না। গৃহই আমাদের দেশের সমাজের ভিত্তি, সেই গৃহকে যদি আমরা সহজ না করি, মঙ্গল না করি, তাহাকে ত্যাগের দ্বারা নির্ম্মল না করি, তবে অর্থোপার্জ্জনের সহস্র নূতন পথ আবিষ্কৃত হইলেও দুর্গতি হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই।

(একবার ভাবিয়া দেখ, আজ চাকরী সমস্ত বাঙালী ভদ্রসমাজের গলায় কি ফাঁসই টানিয়া দিয়াছে! এই চাকরী যতই দুর্লভ হইতে থাক্, ইহার প্রাপ্য যতই স্বল্প হইতে থাক্, ইহার অপমান যতই দুঃসহ হইতে থাক্, আমরা ইহারই কাছে মাথা পাতিয়া দিয়াছি। এই দেশ-ব্যাপী চাকরীর তাড়নায় আজ সমস্ত বাঙালিজাতি দুর্ব্বল, লাঞ্ছিত, আনন্দহীন। এই চাকরীর মায়ায় বাংলার বহুতর সুযোগ্য শিক্ষিত লোক কেবল যে অপমানকেই সম্মান বলিয়া গ্রহণ করিতেছে তাহা নহে, তাহারা দেশের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইতেছে। আজ তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। বিধাতার লীলাসমুদ্র হইতে জোয়ার আসিয়া আজ যখন সমস্ত দেশের হৃদয়স্রোত আত্মশক্তির পথে মুখ ফিরাইয়াছে তখন

বিমুখ কারা? তখন গোয়েন্দাগিরি করিয়া সত্যকে মিথ্যা করিয়া তুলিতেছে কারা? তখন ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া অন্যায়ের দণ্ডে দেশ-পীড়নের সাহায্য করিতেছে কারা? তখন, বালকদের অতি পবিত্র গুরুসম্বন্ধ গ্রহণ করিয়াও তাহাদিগকে অপমান ও নির্য্যাতনের হস্তে অনায়াসে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইতেছে কারা? যারা চাকরীর ফাঁস গলায় পরিয়াছে। তারা যে কেবল অন্যায় করিতে বাধ্য হইতেছে তাহা নয়—তারা নিজেকে ভুলাইতেছে—তারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে যে দেশের লোক ভুল করিতেছে। (বল দেখি, দেশের যোগ্যতম শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কণ্ঠে এই যে চাকুরী-শিকলের টান, ইহা কি প্রাণান্তকর টান!) এই টানকে আমরা প্রত্যহই বাড়াইয়া তুলিতেছি কি করিয়া? নবাবিয়ানা, সাহেবিয়ানা, বাবুয়ানাকে প্রত্যহই উগ্রতর করিয়া মনকে বিলাসের অধীন করিয়া আপন দাসখতের মেয়াদ এবং কড়ার বাড়াইয়া চলিয়াছি।

(জীবনযাত্রাকে লঘু করিবামাত্র দেশব্যাপী এই চাকরীর ফাঁসি এক মুহূর্ত্তে আল্গা হইয়া যাইবে। তখন, চাষবাস বা সামান্য ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইতে ভয় হইবে না। তখন এত অকাতরে অপমান সহ্য করিয়া পড়িয়া থাকা সহজ হইবে না।)

আমাদের মধ্যে বিলাসিতা বাড়িয়াছে বলিয়া অনেকে কল্পনা করেন যে ইহা আমাদের ধনবৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু এ-কথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, পূর্ব্বে যে অর্থ সাধারণের কার্য্যে ব্যয়িত হইত, এখন তাহা ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয়িত হইতেছে। ইহাতে ফল হইতেছে দেশের ভোগবিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে—সহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে—কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই। সমস্ত বাংলা-দেশে পল্লীতে দেবমন্দির ভাঙিয়া পড়িতেছে, পুষ্করিণীর জল স্নান-পানের অযোগ্য হইতেছে, গ্রামগুলি জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে, এবং যে দেশ

বারো মাসে তেরো পার্ব্বণে মুখরিত হইয়া থাকিত, সে দেশ নিরানন্দ নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। দেশের অধিকাংশ অর্থ সহরে আকৃষ্ট হইয়া কোঠাবাড়ি, গাড়িঘোড়া, সাজসরঞ্জাম, আহারবিহারেই উড়িয়া যাইতেছে। অথচ যাঁহারা এইরূপ ভোগবিলাসে ও আড়ম্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় কেহই সুখে স্বচ্ছন্দে নাই ;—তাঁহাদের অনেকেরই টানা-টানি, অনেকেরই ঋণ, অনেকেরই পৈতৃক সম্পত্তিকে মহাজনের দায়মুক্ত করিবার জন্য চিরজীবন নষ্ট হইতেছে—কন্যার বিবাহ দেওয়া, পুত্রকে মানুষ করিয়া তোলা, পৈতৃক কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া চলা, অনেকেরই পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। যে ধন সমস্ত দেশের বিচিত্র অভাব মোচনের জন্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইত, সেই ধন সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া যে ঐশ্বর্য্যের মায়া সৃজন করিতেছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। দেশের ধর্ম্মস্থানকে, বন্ধুস্থানকে, জন্মস্থানকে কৃশ করিয়া কেবল ভোগস্থানকে স্ফীত করিয়া তুলিলে, বাহির হইতে মনে হয় যেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। সেই জন্যই এই ছদ্মবেশী সর্ব্বনাশই আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ। (মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।)

১৩১২

নকলের নাকাল

ইংরাজিতে একটি বচন আছে, সাব্‌লাইম্‌ হইতে হাস্যকর অধিক দূর নহে। সংস্কৃত অলঙ্কারে অদ্ভুতরস ইংরাজি সাব্‌লিমিটির প্রতিশব্দ। কিন্তু অদ্ভুত দুই রকমেরই আছে—হাস্যকর অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর অদ্ভুত।

দুইদিনের জন্য দার্জ্জিলিঙে ভ্রমণ করিতে আসিয়া, এই দুই জাতের অদ্ভুত একত্র দেখা গেল। একদিকে দেবতাত্মা নগাধিরাজ আর-একদিকে বিলাতী-কাপড় পরা বাঙালী। সাব্‌লাইম্‌ এবং হাস্যকর একেবারে গায়ে-গায়ে সংলগ্ন।

ইংরাজী কাপড়টাই যে হাস্যকর, সে-কথা আমি বলি না—বাঙালীর ইংরাজী কাপড় পরাটাই যে হাস্যকর, সে-প্রসঙ্গও আমি তুলিতে চাহি না। কিন্তু বাঙালীর গায়ে বিসদৃশ রকমের বিলাতী কাপড় যদি করুণরসাত্মক না হয়, তবে নিঃসন্দেহই হাস্যকর। আশা করি, এ-সম্বন্ধে কাহারো সহিত মতের অনৈক্য হইবে না।

হয়ত কাপড় এক রকমের টুপি এক রকমের, হয় ত কলার আছে টাই নাই, হয় ত যে রংটা ইংরাজের চক্ষে বিভীষিকা সেই রঙের কুর্ত্তি, হয় ত যে অঙ্গাবরণকে ঘরের বাহিরে ইংরাজ বিবসন বলিয়া গণ্য করে, সেই অসঙ্গত অঙ্গচ্ছদ। এমনতর অজ্ঞানকৃত সং-সজ্জা কেন?

যদি সম্মুখে কাছা ও পশ্চাতে কোঁচা দিয়া কোনো ইংরাজ বাঙালী টোলায় ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে সে ব্যক্তি সম্মানলাভের আশা করিতে পারে না। আমাদের যে বাঙালী ভ্রাতারা অদ্ভুত বিলাতী সাজ পরিয়া গিরিরাজের রাজসভায় ভাঁড় সাজিয়া ফিরেন, তাঁহারা ঘরের কড়ি খরচ করিয়া ইংরাজ দর্শকের কৌতুক বিধান করিয়া থাকেন।

বেচারা কি আর করিবে? ইংরাজ-দস্তুর সে জানিবে কি করিয়া? যিনি বিলাতফেরৎ-বাঙালীর দস্তুর জানেন, তাঁহার স্বদেশীয়ের এই বেশবিভ্রমে তিনিই সব চেয়ে লজ্জাবোধ করেন। তিনিই সব চেয়ে তীব্রস্বরে বলিয়া থাকেন,—যদি না জানে তবে পরে কেন? আমাদের শুদ্ধ ইংরাজের কাছে অপদস্থ করে!

না পরিবে কেন? তুমি যদি পর, এবং পরিয়া দেশী পরিচ্ছদ-ধারীর চেয়ে নিজেকে বড় মনে কর, তবে সে গর্ব্ব হইতে সেই বা

বঞ্চিত হইবে কেন? তোমার যদি মত হয় যে, আমাদের স্বদেশীয় সজ্জা ত্যাজ্য এবং বিদেশী পোষাকই গ্রাহ্য, তবে দলপুষ্টিতে আপত্তি করিলে চলিবে না।

তুমি বলিবে, বিলাতী সাজ পরিতে চাও পর, কিন্তু কোনটা ভদ্র কোনটা অভদ্র, কোনটা সঙ্গত কোনটা অদ্ভুত, সে খবরটা লও।

কিন্তু সে কখনই সম্ভব হইতে পারে না যাহারা ইংরাজী সমাজে নাই, যাহাদের আত্মীয়স্বজন বাঙালী—তাহারা ইংরাজিদস্তুরের আদর্শ কোথায় পাইবে?

যাহাদের টাকা আছে, তাহারা র‍্যাঙ্কিনহার্ম্যানের হস্তে চক্ষু বুজিয়া আত্মসমর্পণ করে, এবং বড় বড় চেকে সই করিয়া দেয়—মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করে, নিশ্চয়ই আর কিছু না হউক, আমাকে দেখিয়া অন্তত ভদ্র ফিরিঙ্গি বলিয়া লোকে আন্দাজ করিবে—ইংরাজিকায়দা জানে না এমন মূর্চ্ছাকির অপবাদ কেহ দিতে পারিবে না।

কিন্তু পনেরো-আনা বাঙালিরই অর্থাভাব—এবং চাঁদানিই তাহাদের বাঙালী সজ্জার চরম মোক্ষস্থান। অতএব উল্টা-পাল্টা ভুলচুক হইতেই হইবে। এমন স্থলে পরের সাজ পরিতে গেলে, অধিকাংশ লোকেরই সং-সাজা বই গতি নাই।

দুই চারিটা কাক অবস্থাবিশেষে ময়ূরের পুচ্ছ মানান-সই করিয়া পরিতেও পারে—কিন্তু বাকি কাকেরা তাহা কোনোমতেই পারিবে না—কারণ, ময়ূরসমাজে তাহাদের গতিবিধি নাই—এমন অবস্থায় সমস্ত কাক-সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত কয়েকটি ছদ্মবেশীকে ময়ূরপুচ্ছের লোভ সম্বরণ করিতেই হইবে। না যদি করেন, তবে পরপুচ্ছ বিকৃতভাবে আস্ফালনের প্রহসন সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এই লজ্জা হইতে, ইংরাজিয়ানার এই বিকার হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা কি সক্ষম নকলকারীকে সানুনয়ে অনুরোধ

করিতে পারি না? কারণ, তাঁহারা সক্ষম, আর সকলে অক্ষম। এমন কি, অবস্থাবিশেষে তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরাও অক্ষম হইয়া পড়িবে। তাহারা যখন ফিরিঙ্গিলীলার অধস্তন রসাতলের গলিতে গলিতে সমাজ-চ্যুত আবর্জ্জনার মত পড়িয়া থাকিবে, তখন কি ব্যাঙ্কিনবিলাসীর প্রেতাত্মা শান্তিলাভ করিবে?

দরিদ্র কোনোমতেই পরের নকল ভদ্ররকমে করিতে পারে না। নকল করিবার কাঠখড় বেশি। বাহির হইতে তাহার আয়োজন করিতে হয়। যাহাকে নকল করিতে হইবে, সর্ব্বদা তাহার সংসর্গে থাকিতে হয়—দরিদ্রের পক্ষে সেইটেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। সুতরাং সে অবস্থায় নকল করিতে হইলে, আদর্শভ্রষ্ট হইয়া কিম্ভূতকিমাকার একটা ব্যাপার হইয়া পড়ে। বাঙ্গালীর পক্ষে খাটো ধূতি পরা লজ্জাকর নহে, কিন্তু খাটো প্যাণ্ট্‌লুন পরা লজ্জাজনক। কারণ, খাটো প্যাণ্ট্‌লুনে কেবল অসামর্থ্য বুঝায় না, তাহাতে পর সাজিবার যে চেষ্টা, যে স্পর্দ্ধা প্রকাশ পায়, তাহা দারিদ্র্যের সহিত কিছুতেই সুসঙ্গত নহে।

আচার-ব্যবহার সাজ-সজ্জা উদ্ভিদের মত—তাহাকে উপ্‌ড়াইয়া আনিলে শুকাইয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। বিলাতী বেশভূষা-আদব-কায়দার মাটি এখানে কোথায়? সে কোথা হইতে তাহার অভ্যস্ত রস আকর্ষণ করিয়া সজীব থাকিবে? ব্যক্তিবিশেষ খরচপত্র করিয়া কৃত্রিম উপায়ে মাটি আমদানী করিতে পারেন এবং দিনরাত সযত্ন-সচেতন থাকিয়া তাহাকে কোনোমতে খাড়া রাখিতে পারেন। কিন্তু সে কেবল দুইচারিজন সৌখীনের দ্বারাই সাধ্য।

যাহাকে পালন করিতে—সজীব রাখিতে পারিবে না, তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া পচাইয়া হাওয়া খারাপ করিবার দরকার? ইহাতে পরেরটাও নষ্ট হয়, নিজেরটাও মাটি হইয়া যায়। সমস্ত মাটি করিবার সেই আয়োজন বাংলাদেশেই দেখিতেছি।

তবে কি পরিবর্ত্তন হইবে না? যেখানে যাহা আছে, চিরকাল কি সেখানে তাহা একই ভাবে চলে?

(প্রয়োজনের নিয়মে পরিবর্ত্তন হইবে, অনুকরণের নিয়মে নহে।) কারণ, অনুকরণ অনেক সময়ই প্রয়োজনবিরুদ্ধ। তাহা সুখশান্তি স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। চতুর্দ্দিকের অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই। তাহাকে চেষ্টা করিয়া আনিতে হয়, কষ্ট করিয়া রক্ষা করিতে হয়।

অতএব বেলোয় ভ্রমণের জন্য, আপিসে বাহির হইবার জন্য, নূতন প্রয়োজনের জন্য, ছাঁটা কাটা কাপড় বানাইয়া লও। সে তুমি নিজের দেশ, নিজের পরিবেশ, নিজের পূর্ব্বাপরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তুত কর। সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ, ভাববিরুদ্ধ, সঙ্গতিবিরুদ্ধ অনুকরণের প্রতি হতবুদ্ধির ন্যায় ধাবিত হইয়ো না।

পুরাতনের পরিবর্ত্তন ও নূতনের নির্ম্মাণে দোষ নাই। আবশ্যকের অনুরোধে তাহা সকল জাতকেই সর্ব্বদা করিতে হয়। কিন্তু এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ অনুকরণ প্রয়োজনের দোহাই দিয়া চলে না। সে প্রয়োজনের দোহাই একটা ছুতামাত্র। কারণ সম্পূর্ণ অনুকরণ কখনই সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না। তাহার হয় ত একাংশ কাজের হইতে পারে, অপরাংশ বাহুল্য। তাহার ছাঁটা কোর্ত্তা হয় ত দৌড়ধাপের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহার ওয়েষ্টকোট্ হয় ত অনাবশ্যক এবং উত্তাপজনক। তাহার টুপিটা হয়ত খপ্ করিয়া মাথায় পরা সহজ হইতে পারে, কিন্তু তাহার টাই কলার বাঁধিতে অনর্থক সময় দিতে হয়।

(যেখানে পরিবর্ত্তন ও নূতন নির্ম্মাণ অসম্ভব ও সাধ্যাতীত, সেই-খানেই অনুকরণ মার্জ্জনীয় হইতে পারে। বেশভূষায় সে কথা কোনো-ক্রমেই খাটে না।)

বিশেষত বেশভূষায় কেবলমাত্র অঙ্গাবরণের প্রয়োজন সাধন করে না, তাহাতে ভদ্রাভদ্র, দেশী-বিদেশী, স্বজাতি-বিজাতির পরিচয় দেওয়া হয়। ইংরাজি কাপড়ের ভদ্রতা ইংরাজ জানে। আমাদের ভদ্রলোকদের অধিকাংশের তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। জানিতে গেলেও সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে পরের মুখ তাকাইতে হয়।

তার পরে স্বজাতি-বিজাতির কথা। কেহ কেহ বলেন, স্বজাতির পরিচয় লুকাইবার জন্যই বিলাতী কাপড়ের প্রয়োজন হয়। এ-কথা বলিতে যাহার লজ্জাবোধ না হয়, তাহাকে লজ্জা দেওয়া কাহারো সাধ্য নহে। রেলোয়ের ফিরিঙ্গি গার্ড, ফিরিঙ্গিভ্রাতা মনে করিয়া যে আদর করে, তাহার প্রলোভন সম্বরণ করাই ভাল। কোনো কোনো রেল-লাইনে দেশী-বিলাতির স্বতন্ত্র গাড়ি আছে, কোনো কোনো হোটেলে দেশী লোককে প্রবেশ করিতে দেয় না, সেজন্য রাগিয়া কষ্ট পাইবার অবসর যদি হাতে থাকে, তবে সে-কষ্ট স্বীকার কর, কিন্তু জন্ম ভাঁড়াইয়া সেই গাড়িতে বা সেই হোটেলে প্রবেশ করিলে সম্মানের কি বৃদ্ধি হয়, তাহা বুঝা কঠিন।

পরিবর্ত্তন কোন্ পর্য্যন্ত গেলে অনুকরণের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা শক্ত। তবে সাধারণ নিয়মের স্বরূপ একটা কথা বলা যাইতে পারে।

যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত বেখাপ্ হয় না, তাহাকে বলে গ্রহণ করা, যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহাকে বলে অনুকরণ করা।

মোজা পরিলে কোট পরা অনিবার্য্য হয় না, ধুতির সঙ্গে মোজা বিকল্পে চলিয়া যায়। কিন্তু কোটের সঙ্গে ধুতি, অথবা হ্যাটের সঙ্গে চাপকান চলে না। সাধু ইংরাজিভাষার মধ্যেও মাঝে মাঝে ফরাসী মিশাল্ চলে, তাহা ইংরাজি পাঠকেরা জানেন। কিন্তু কি পর্য্যন্ত চলিতে

পারে, নিশ্চযই তাহাব একটা অলিখিত নিষম আছে—সে নিয়ম বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে শেখানো বাহুল্য। তথাপি তার্কিক বলিতে পারে, তুমি যদি অতটা দূবে গেলে, আমি না হয় আবো কিছুদূব গেলাম, কে আমাকে নিবাবণ কবিবে? সে ত ঠিক কথা। তোমাব রুচি যদি তোমাকে নিবারণ না কবে, তবে কাহাব পিতৃপুরুষের সাধ্য তোমাকে নিবাবণ কবিয়া বাখে?

বেশভূষাতেও সেই তর্ক চলে। যিনি আগাগোড়া বিলাতী ধবিযাছেন, তিনি সমালোচককে বলেন, তুমি কেন চাপকানেব সঙ্গে প্যাণ্ট্‌লুন পবিয়াছ? অবশেষে তর্কটা ঝগড়ায় গিয়া দাঁড়ায।

সে স্থলে আমাব বক্তব্য এই যে, যদি অন্যায় হইয়া থাকে নিন্দা কর, সংশোধন কর, প্যাণ্ট্‌লুনের পাববর্ত্তে অন্য কোনো প্রকার পায়জামা যদি কার্য্যকব ও সুসঙ্গত হয়, তবে তাহাব প্রবর্ত্তন কব—তাই বলিয়া তুমি আগাগোড়া দেশীবস্ত্র পরিহাব কবিবে কেন? একজন এক কান কাটিযাছে বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি খামকা দুই কান কাটিয়া বসিবে, ইহাব বাহাদুরীটা কোথায়, বুঝিতে পাবি না।

নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে যখন প্রথম পরিবর্ত্তনের আরম্ভ হয়, তখন একটা অনিশ্চয়তাব প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তখন কে কতদূরে যাইবে, তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে না। কিছুদিনের ঠেলাঠেলিব পরে পরস্পব আপোসে সীমানা পাকা হইয়া আসে। সেই অনিবার্য্য অনিশ্চয়তার প্রতি দোষারোপ করিয়া যিনি পূবা নকলেব দিকে যান, তিনি অত্যন্ত কুদৃষ্টান্ত দেখান।

কারণ, আলস্য সংক্রামক! পরের তৈবি জিনিষের লোভে নিজের সমস্ত চেষ্টা বিসর্জ্জন দিবার নজীর পাইলে, লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হয়। ভুলিয়া যায়, পবের জিনিষ কখনই আপনাব করা যায় না। ভুলিয়া যায, পরের কাপড় পরিতে হইলে, চিরকালই পরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে।

জড়ত্ব যাহার আরম্ভ, বিকার তাহার পরিণাম। আজ যদি বলি, কে অত ভাবে, তার চেয়ে বিলাতি দোকানে গিয়া এক স্যুট্ অর্ডার দিয়া আসি—তবে কাল বলিব, প্যাণ্ট্‌লুনটা খাট হইয়া গেছে, কে এত হাঙ্গাম করে, ইহাতেই কাজ চলিয়া যাইবে।

কাজ চলিয়া যায়। কারণ, বাঙালীসমাজে বিলাতি কাপড়ের অসঙ্গতির দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করে না। সেইজন্য বিলাতফেরৎদের মধ্যেও বিলাতি-সাজ-সম্বন্ধে ঢিলাভাব দেখা যায়,—সস্তার চেষ্টায় বা আলস্যের গতিকে তাঁহারা অনেকে এমন ভাবে বেশবিন্যাস করেন যাহা বিধিমত অভদ্র।

কেবল তাহাই নহে। বাঙালী বন্ধুর বাড়িতে বিবাহ প্রভৃতি শুভকর্ম্মে বাঙালীভদ্রলোক সাজিয়া আসিতে তাঁহারা অবজ্ঞা করেন, আবার বিলাতী-ভদ্রতার নিয়মে নিমন্ত্রণসাজ পরিয়া আসিতেও আলস্য করেন। পরসজ্জা-সম্বন্ধে কোনটা বিহিত, কোন্‌টা অবিহিত সেটা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই বলিয়া, তাঁহারা শিষ্টসমাজের বিধিবিধানের অতীত হইয়া যাইতেছেন। ইংরাজি-সমাজে তাঁহারা সামাজিকভাবে চলিতে ফিরিতে পান না। দেশী সমাজকে তাঁহারা সামাজিকভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন—সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত বিধান নিজের বিধান, সুবিধার বিধান,—সে বিধানে আলস্য-ঔদাসীন্যকে বাধা দিবার কিছুই নাই। বিলাতের এই সকল ছাড়াকাপড় ইহাদের পরপুরুষের গাত্রে কিরূপ বীভৎস হইয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিলে লোমহর্ষণ উপস্থিত হয়।

কেবল সাজসজ্জা নহে, আচার-ব্যবহারে এ-সকল কথা আরো অধিক খাটে। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশী প্রথা হইতে যাঁহারা নিজেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারকে সদাচার-সদ্‌ব্যবহারের সীমামধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে

কিসে ? যে ইংরাজের আচার তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতে পারেন না, দেশী সমাজের ঘনিষ্ঠতা তাহারা বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়াছেন।

এঞ্জিন কাটিয়া লইলেও গাড়ি খানিকক্ষণ চলিতে পারে—বেগ একেবারে বন্ধ হয় না। বিলাতের ধাক্কা বিলাতফেরতের উপর কিছুদিন থাকিতে পারে—তাহার পরে চলিবে কিসে ?

সমাজের হিতার্থে সকল সমাজের মধ্যেই কতকগুলি কঠোর শাসন আপনি অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। যাঁহাবা স্বেচ্ছাক্রমে আত্ম-সমাজের ত্যাজ্যপুত্র, এবং চেষ্টাসত্ত্বেও পরসমাজের পোষ্যপুত্র নহেন, তাঁহারা স্বভাবতই দুই সমাজের শাসন পরিত্যাগ করিয়া সুখটুকু লইবার চেষ্টা কবিবেন। তাহাতে কি মঙ্গল হইবে ?

ইহাদের একরকম চলিয়া যাইবে, কিন্তু ইহাদেব পুত্রপৌত্রেরা কি করিবে ? এবং যাহারা নকলেব নকল করে, তাহাদেব কি দুরবস্থা হইবে ?

দেশী দরিদ্রেরও সমাজ আছে। দরিদ্র হইলেও সে ভদ্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু বিলাতী-সাজা দরিদ্রের কোথাও স্থান নাই। বাঙালী-সাহেব কেবলমাত্র ধনসম্পদ্ ও ক্ষমতাব দ্বারা আপনাকে দুর্গতির উর্দ্ধে খাড়া রাখিতে পারে। ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইবামাত্র সেই সাহেবেব পুত্রটি সর্ব্বপ্রকার আশ্রয়হীন অবমাননার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন তাহার ক্ষমতাও নাই, সমাজও নাই। তাহার নূতনলব্ধ পৈতৃক গৌরবেরও চিহ্ন নাই, চিরাগত পৈতামহিক সমাজেরও অবলম্বন নাই। তখন সে কে ?

কেবলমাত্র অনুকরণ এবং সুবিধাব আকর্ষণে আত্মসমাজ হইতে যাঁহারা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে না, ইহা নিশ্চয়—এবং যে দুর্ব্বলচিত্তগণ ইহাদের

অনুকরণে ধাবিত হইবে, তাহারা সর্ব্বপ্রকারে হাস্যজনক হইয়া উঠিবে, ইহাতেও সন্দেহ নাই।

যেটা লজ্জার বিষয়, সেইটে লইয়াই বিশেষরূপ গৌরব অনুভব করিতে বসিলে, বন্ধুর কর্ত্তব্য, তাহাকে সচেতন করিয়া দেওয়া। যিনি সাহেবের অনুকরণ করিয়াছি মনে করিয়া গর্ব্ববোধ করেন, তিনি বস্তুত সাহেবীর অনুকরণ করিতেছেন। সাহেবীর অনুকরণ সহজ, কারণ তাহা বাহ্যিক জড় অংশ; সাহেবের অনুকরণ শক্ত, কারণ তাহা আন্তরিক মনুষ্যত্ব। যদি সাহেবের অনুকরণ করিবার শক্তি তাঁহার থাকিত, তবে সাহেবীর অনুকরণ কখনই করিতেন না। অতএব কেহ যদি শিব গড়িতে গিয়া মাটির গুণে অন্য কিছু গড়িয়া বসেন, তবে সেটা লইয়া লম্ফঝম্ফ না করাই শ্রেয়।

আজকাল একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের দেশে দেখা যায়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিলাতী পোষাক পরেন স্ত্রীগণকে তাঁহারা সাড়ি পরাইয়া বাহির করিতে কুণ্ঠিত হন না। একাসনে গাড়ির দক্ষিণ ভাগে হ্যাট্ কোট, বামভাগে বোম্বাই সাড়ি। নব্যবাংলার আদর্শে হরগৌরীরূপ যদি কোনো চিত্রকর চিত্রিত করেন তবে তাহা যদি বা "সায়াইম্" না হয় অন্তত "সায়াইমের" অদূরবর্ত্তী আর একটা কিছু হইয়া দাঁড়াইবে।

পশুপক্ষীর রাজ্যে প্রকৃতি অনেক সময় স্ত্রীপুরুষের সাজের এত প্রভেদ করেন যে দম্পতীকে এক জাতীয় বলিয়া চেনা বিশেষ অভিজ্ঞতা-সাধ্য হইয়া পড়ে। কেশরের অভাবে সিংহীকে সিংহের পত্নী বলিয়া চেনা কঠিন এবং কলাপের অভাবে ময়ূরের সহিত ময়ূরীর কুটুম্বিতা নির্ণয় দুরূহ।

বাংলাতেও যদি প্রকৃতি তেমন একটা বিধান করিয়া দিতেন; স্বামী যদি তাঁহার নিজের পেখম বিস্তার করিয়া সহধর্ম্মিণীর উপরে টেক্কা দিতে পারিতেন তাহা হইলে কোনো কথাই উঠিত না। কিন্তু গৃহকর্ত্তা

যদি পরের পেখম পুচ্ছে গুঁজিয়া ঘরের মধ্যে অনৈক্য বিস্তার করেন, তাহা হইলে সেটা যে কেবল ঘরের পক্ষে আপশোষের বিষয় হয় তাহা নহে, পরের চক্ষে হাস্যেরও বিষয় হইয়া ওঠে।

যাহা হউক ব্যাপারটা যতই অসঙ্গত হউক, যখন ঘটিয়াছে তখন ইহার মধ্যে সঙ্গত কারণ একটুকু আছেই।

ইংরাজি কাপড়ে "খেলো" হইলে যত খেলো এবং যত দীন দেখিতে হয় এমন দেশী কাপড়ে নয়। তাহার একটা কারণ, ইংরাজি সাজে সারল্য নাই, তাহার মধ্যে আয়োজন এবং চেষ্টার বাহুল্য আছে। ইংরাজি কাপড় যদি গায়ে ফিট্ না হইল, যদি তাহাতে টানাটানি প্রকাশ পাইল তবে তাহা ভদ্রতার পক্ষে অত্যন্ত বেয়াব্রু হইয়া পড়ে কারণ ইংরাজি কাপড়ের আগাগোড়ায় গায়ে ফিট্ করিবার চরম উদ্দেশ্য, দেহটাকে খোসার মত মুড়িয়া ফেলিবার সযত্ন চেষ্টা সর্ব্বদা বর্ত্তমান। সুতরাং প্যাণ্ট্‌লুন যদি একটু খাটো হয়, কোট যদি একটু উঠিয়া পড়ে, তবে নিজেকেই ছোট বলিয়া মনে হয়, সেই টুকুতেই আত্মসম্মানের লাঘব হইয়া থাকে ;—যে ব্যক্তি এ-সম্বন্ধে অজ্ঞতাসুখে অচেতন, অন্য লোকে তাহার হইয়া লজ্জা বোধ করে।

এ-সম্বন্ধে দুটো কথা আছে। প্রথমে, ঠিক দস্তুরমত ফ্যাশানমত কাপড় পরিতেই হইবে এমন কি মাথার দিব্য আছে! এ কথাটা খুব বড় লোকের, খুব স্বাধীনচেতার মত কথা বটে। দশের দাসত্ব, প্রথার গোলামী, এ-সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে ধিক্! কিন্তু এ স্বাধীনতার কথা তাহাকে শোভা পায় না যে লোক গোড়াতেই বিলাতী সাজ পরিয়া অনুকরণের দাসখত আপাদমস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছে। পাঁটা যদি নিজের হয় তবে তাহা কাটা সম্বন্ধেও স্বাধীনতা থাকে ; নিজেদের ফ্যাসানে যদি চলি তবে তাহাকে লঙ্ঘন করিয়াও মহত্ত্ব দেখাইতে পারি। পরের পথেও চলিব আবার সে-পথ কলুষিতও করিব এমন বীরত্বের মহত্ত্ব বোঝা যায় না!

আর একটা কথা এই যে, যেমন ব্রাহ্মণের পৈতা, তেমনি বিলাত ফেরতের বিলাতী কাপড়, ওটা সাম্প্রদায়িক লক্ষণরূপে স্বতন্ত্র করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সে বিধান চলিবে না। গোড়ায় সেই মতই ছিল বটে, কিন্তু আজকাল সমুদ্র পার না হইয়াও অনেকে চিহ্ন ধারণ করিতে সুরু করিয়াছেন। আমাদের উর্ব্বর দেশে ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতি যে কোনো ব্যাধি আসিয়াছে ব্যাপ্ত না হইয়া ছাড়ে নাই; বিলাতী কাপড়েরও দিন আসিয়াছে, ইহাকে দেশেব কোনো অংশবিশেষে পৃথক-কবণ কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

দীন ভারতবর্ষ যেদিন ইংলণ্ডের পবিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্রে ভূষিত হইয়া দাঁড়াইবে তখন তাহার দৈন্য কি বীভৎস বিজাতীয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে! আজ যাহা কেবলমাত্র শোকাবহ আছে সেদিন তাহা কি নিষ্ঠুর হাস্য-জনক হইয়া উঠিবে! আজ যাহা বিরল-বসনের সরল নম্রতাব দ্বারা সম্বৃত, সেদিন তাহা জীর্ণ কোর্ত্তার ছিদ্রপথে অর্দ্ধ-আবরণের ইতরতায় কি নির্লজ্জভাবে দৃশ্যমান হইয়া উঠিবে। চুণাগলি যেদিন বিস্তীর্ণ হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্রাস করিতে আসিবে সেদিন যেন ভারতবর্ষ একটি পা মাত্র অগ্রসর হইয়া তাঁহারই সমুদ্রের ঘাটে তাঁহার মলিন প্যাণ্টলুনের ছিন্ন প্রান্ত হইতে ভাঙা টুপির মাথাটা পর্য্যন্ত নীলাম্বুরাশির মধ্যে নিলীন করিয়া নারায়ণের অনন্ত-শয়নের অংশ লাভ করেন।

কিন্তু এ হ'ল সেণ্টিমেণ্ট্, ভাবুকতা,—প্রকৃতিস্থ কাজের লোকের মত কথা ইহাকে বলা যায় না। ইহা সেণ্টিমেণ্ট্ বটে! মরিব—তবু অপমান সহিব না, ইহাও সেণ্টিমেণ্ট্! বিলাতী কাপড় ইংরাজের জাতীয় গৌরবচিহ্ন বলিয়া সেই ছদ্মবেশে স্বদেশকে অপমানিত করিব না ইহাও সেণ্টিমেণ্ট্। এই সমস্ত সেণ্টিমেণ্টই দেশের যথার্থ বল, দেশের যথার্থ গৌরব; অর্থে নহে, রাজপদে নহে, ডাক্তারির নৈপুণ্য অথবা আইনব্যবসায়ের উন্নতিসাধনে নহে।

আশা করিতেছি এই সেণ্টিমেণ্টের কিঞ্চিৎ আভাস আছে বলিয়াই বিলাতী বেশধারিগণ অত্যন্ত অসঙ্গত হইলেও তাঁহাদের অর্দ্ধাঙ্গিনীদের সাড়ি রক্ষা করিয়াছেন।

পুরুষেরা কর্ম্মক্ষেত্রে কাজের সুবিধার জন্য ভাবগৌরবকে বলিদান দিতে অনেকে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু স্ত্রীগণ যেখানে আছেন সেখানে সৌন্দর্য্য এবং ভাবুকতার বহুরূপী কর্ম্ম আজিও আসিয়া প্রবেশ করে নাই। সেইখানে একটু ভাবরক্ষার জায়গা রহিয়াছে, সেখানে আর স্কাতোদর গাউন আসিয়া আমাদের দেশীয় ভাবের শেষ লক্ষ্যটুকু গ্রাস করিয়া যায় নাই।

সাহেবিয়ানাকেই যদি চরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হইলে, স্ত্রীকে বিবি না সাজাইলে সে গৌরব অর্দ্ধেক অসম্পূর্ণ থাকে। তাহা যখন সাজাই নাই তখন সাড়িপরা স্ত্রীকে বামে বসাইয়া এ-কথা প্রকাশ্যে কবুল করিতেছি যে, আমি যাহা করিয়াছি তাহা সুবিধার খাতিরে;—দেখ, ভাবের খাতির রক্ষা করিয়াছি, আমার ঘরের মধ্যে, আমার স্ত্রীগণের পবিত্র দেহে।

কিন্তু আমরা আশঙ্কা করিতেছি ইঁহাদের অনেকেই এই প্রসঙ্গে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথা বলিবেন। বলিবেন, পুরুষের উপযোগী জাতীয় পরিচ্ছদ তোমাদের কাছে কোথায়, যে আমরা পরিব? ইহাকেই বলে আঘাতের উপর অবমাননা। একেত পরিবার বেলা ইচ্ছাসুখেই বিলাতী কাপড় পরিলেন তাহার পর বলিবার বেলা সুর ধরিলেন যে তোমাদের কোনো কাপড় ছিল না বলিয়াই আমাদিগকে এ-বেশ ধরিতে হইয়াছে। আমরা পরের কাপড় পরিয়াছি বটে কিন্তু তোমাদের কোনো কাপড়ই নাই—সে আরো খারাপ!

বাঙালী-সাহেবেরা ব্যঙ্গস্বরে অবজ্ঞা করিয়া বলেন, তোমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ পরিতে গেলে পায়ে চটি, হাঁটুর উপরে ধুতি এবং

কাঁধের উপরে একখানা চাদর পরিতে হয়। সে আমরা কিছুতেই পারিব না। শুনিয়া ক্ষোভে নিরুত্তর হইয়া থাকি।

যদিও কাপড়ের উপর মানুষ নির্ভর করে না, মানুষের উপর কাপড় নির্ভর করে এবং সে-হিসাবে মোটা ধুতিচাদর লেশমাত্র লজ্জাকর নহে। বিদ্যাসাগর,—একা বিদ্যাসাগর নহেন—আমাদের বহুসংখ্যক মোটা চাদরধারী ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সহিত গৌরবে গাম্ভীর্য্যে কোর্ত্তাগ্রস্ত কোনো বিলাতফেরতই তুলনীয় হইতে পারেন না। যে ব্রাহ্মণেরা এককালে ভারতবর্ষকে সভ্যতার উচ্চ শিখরে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বসনের একান্ত বিরলতা জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু সে-সকল তর্ক তুলিতে চাহি না। কারণ, সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং সেই পরিবর্ত্তনের একেবারে বিপরীত মুখে চলিতে গেলে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

অতএব এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বাংলাদেশে যে-ভাবে ধুতি চাদর পরা হয় তাহা আধুনিক কাজকর্ম্ম এবং আপিশ আদালতের উপযোগী নয়। কিন্তু আচ্‌কান চাপকানের প্রতি সে দোষারোপ করা যায় না।

সাহেবী বেশধারীরা বলেন, ওটাতো বিদেশী সাজ। বলেন বটে, কিন্তু সে একটা জেদের তর্ক মাত্র। অর্থাৎ বিদেশী বলিয়া চাপকান তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই, সাহেব সাজিবার একটা কোনো বিশেষ প্রলোভন আছে বলিয়াই ত্যাগ করিয়াছেন।

কারণ, যদি চাপকান এবং কোট দুটোই তাঁহার নিকট সমান নূতন হইত, যদি তাঁহাকে আপিশে প্রবেশ ও রেলগাড়ীতে পদার্পণ করিবার দিন দুটোর মধ্যে একটা প্রথম বাছিয়া লইতে হইত তাহা হইলে এ-সকল তর্কের উত্থাপন হইতে পারিত। চাপকান তাঁহার গায়েই ছিল তিনি সেটা তাঁহার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাহা ত্যাগ করিয়া যেদিন কালো কুর্ত্তির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক গলায়

টাই বাঁধিলেন, সে-দিন আনন্দে এবং গৌরবে এ তর্ক তোলেন নাই যে, পিতা ও চাপকানটা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন।

তোলাও সহজ নহে। কারণ, চাপকানের ইতিবৃত্ত ঠিক তিনিও জানেন না আমিও জানি না। কেন না, মুসলমানদের সহিত বসন-ভূষণ-শিল্পসাহিত্যে আমাদের এমন ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদান হইয়া গেছে যে উহার মধ্যে কতটা কার তাহার সীমা নির্ণয় করা কঠিন। চাপকান হিন্দুমুসলমানের মিলিত বস্ত্র। উহা যে-সকল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে তাহাতে হিন্দুমুসলমান উভয়েরই সংহায়তা করিয়াছে। এখনো পশ্চিমে ভিন্ন ভিন্ন রাজঅধিকারে চাপকানের অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়, সে বৈচিত্র্যে যে একমাত্র মুসলমানের কর্ত্তৃত্ব তাহা নহে, তাহার মধ্যে হিন্দুরও স্বাধীনতা আছে, যেমন আমাদের ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত মুসলমানেরও বটে, হিন্দুরও বটে, তাহাতে উভয় জাতীয় গুণীরই হাত আছে; যেমন মুসলমান রাজ্য প্রণালীতে হিন্দুমুসলমান উভয়েরই স্বাধীন ঐক্য ছিল।

তাহা না হইয়া যায় না। কারণ, মুসলমানগণ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল। তাহাদের শিল্পবিলাস ও নীতিপদ্ধতির আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে সুদূরে থাকিয়া আপন আদিমতা রক্ষা করে নাই। এবং মুসলমান যেমন বলের দ্বারা ভারতবর্ষকে আপনার করিয়া লইয়াছিল ভারতবর্ষও তেমনি স্বভাবের অমোঘ নিয়মে কেবল আপন বিপুলতা আপন নিগূঢ় প্রাণশক্তি দ্বারা মুসলমানকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, স্থচিশিল্প, ধাতুদ্রব্য নির্ম্মাণ, দন্তকার্য্য, নৃত্য, গীত, এবং রাজকার্য্য—মুসলমানের আমলে ইহার কোনোটাই একমাত্র মুসলমান বা হিন্দু দ্বারা হয় নাই, উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া হইয়াছে! তখন ভারত-বর্ষের যে একটি বাহ্যাবরণ নির্ম্মিত হইতেছিল তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের ডান হাত ও বাম হাত হইয়া টানা ও পোড়েন বুনিতেছিল।

অতএব এই মিশ্রণের মধ্যে চাপকানের খাঁটি মুসলমানত্ব যিনি গায়ের জোরে প্রমাণ করিতে চান, তাঁহাকে এই কথা বলিতে হয় যে, তোমার যখন গায়ের এতই জোর তখন কিছুমাত্র প্রমাণ না করিয়া ঐ গায়ের জোরেই হ্যাট্‌কোট অবলম্বন কর আমরা মনের আক্ষেপ নীরবে মনের মধ্যে পরিপাক করি।

এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায় তবে তাহা কোনোমতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না। যদি বিধাতার কৃপায় কোনোদিন সহস্র অনৈক্যের দ্বারা খণ্ডিত হিন্দুরা এক হইতে পারে তবে হিন্দুর সহিত মুসলমানের এক হওয়াও বিচিত্র হইবে না। হিন্দু মুসলমানে ধর্ম্মে নাও মিলিতে পারে কিন্তু জনবন্ধনে মিলিবে —আমাদের শিক্ষা, আমাদের চেষ্টা, আমাদের মহৎ স্বার্থ সেই দিকে অনবরত কাজ করিতেছে। অতএব যে বেশ আমাদের জাতীয় বেশ হইবে তাহা হিন্দুমুসলমানের বেশ।

যদি সত্য হয় চাপকান পায়জামা একমাত্র মুসলমানদেরই উদ্ভাবিত সজ্জা, তথাপি একথা যখন স্মরণ করি, রাজপুতবীরগণ, শিখসর্দারবর্গ এই বেশ পরিধান করিয়াছেন, রাণা প্রতাপ, রণজিৎ সিংহ, এই চাপকান পায়জামা ব্যবহার করিয়া ইহাকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, তখন মিষ্টার ঘোষ বোস মিত্র, চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে মুখুয্যের এ বেশ পরিতে লজ্জার কারণ কিছুই দেখি না।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক কথা এই যে চাপকান পায়জামা দেখিতে অতি কুশ্রী। তর্ক যখন এইখানে আসিয়া ঠেকে তখন মানে মানে চুপ করিয়া যাওয়া শ্রেয়। কারণ রুচির তর্কের শেষকালে প্রায় বাহুবলে আসিয়াই মীমাংসা হয়।

১৩০৮।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

আমি যখন য়ুরোপে গেলুম তখন কেবল দেখ্‌লুম, জাহাজ চল্‌চে, গাড়ি চল্‌চে, লোক চল্‌চে, দোকান চল্‌চে, থিয়েটার চল্‌চে পার্লেমেণ্ট চল্‌চে—সকলই চল্‌চে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল বিষয়েই একটা বিপর্য্যয় চেষ্টা অহর্নিশি নিরতিশয় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে, মানুষের ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমা পাবার জন্যে সকলে মিলে অশ্রান্তভাবে ধাবিত হচ্চে।

দেখে' আমার ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে, এবং সেইসঙ্গে বিস্ময়-সহকারে বলে—হাঁ, এ'রাই রাজার জাত বটে। আমাদের পক্ষে যা যথেষ্টের চেয়ে ঢের বেশি এদের কাছে তা অকিঞ্চন দারিদ্র্য। এদের অতি সামান্য সুবিধাটুকুর জন্যেও, এদের অতি ক্ষণিক আমোদের উদ্দেশেও মানুষের শক্তি আপন পেশী ও স্নায়ু চরম সীমায় আকর্ষণ করে' খেটে মরচে।

জাহাজে বসে' ভাবতুম এই যে জাহাজটি অহর্নিশি লৌহবক্ষ বিস্ফারিত করে' চলেছে, ছাদের উপরে নরনারীগণ কেউ বা বিশ্রাম-সুখে কেউ বা ক্রীড়াকৌতুকে নিযুক্ত কিন্তু এর গোপন জঠরের মধ্যে যেখানে অনন্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বলচে, যেখানে অঙ্গারকৃষ্ণ নিরপরাধ নারকীরা প্রতিনিয়তই জীবনকে দগ্ধ করে' সংক্ষিপ্ত করচে, সেখানে কি অসহ্য চেষ্টা, কি দুঃসাধ্য পরিশ্রম, মানব জীবনের কি নির্দ্দয় অপব্যয় অশ্রান্ত-ভাবে চল্‌চে। কিন্তু কি করা যাবে? আমাদের মানব রাজা চলেচেন, কোথাও তিনি থাম্‌তে চাননা, অনর্থক কাল নষ্ট কিম্বা পথ-কষ্ট সহ্য করতে তিনি অসম্মত।

তাঁর জন্যে অবিশ্রাম যন্ত্রচালনা করে' কেবলমাত্র দীর্ঘ পথকে হ্রাস

করাই যথেষ্ট নয় ; তিনি প্রাসাদে যেমন আরামে, যেমন ঐশ্বর্য্যে থাকেন পথেও তার তিলমাত্র ত্রুটি চান না। সেবার জন্যে শত শত ভৃত্য অবিরত নিযুক্ত, ভোজনশালা সঙ্গীতমণ্ডপ সুসজ্জিত স্বর্ণচিত্রিত শ্বেত-প্রস্তরমণ্ডিত শত বিদ্যুদ্দীপে সমুজ্জ্বল। আহারকালে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের সীমা নেই। জাহাজ পরিষ্কার রাখ্‌বার জন্যে ক ত নিয়ম কত বন্দোবস্ত ; জাহাজের প্রত্যেক দড়িটুকু যথাস্থানে সুশোভনভাবে গুছিয়ে রাখ্‌বার জন্যে কত দৃষ্টি।

যেমন জাহাজে, তেমনি পথে ঘাটে দোকানে নাট্যশালায় গৃহে সর্ব্বত্রই আয়োজনের আর অবধি নেই। দশদিকেই মহামাহিম মানুষের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ষোড়শোপচারে পূজা হচ্চে। তিনি মুহূর্ত্তকালের জন্যে যা'তে সন্তোষ লাভ করবেন তার জন্যে সম্বৎসরকাল চেষ্টা চল্‌চে।

এ-রকম চরমচেষ্টাচালিত সভ্যতা-যন্ত্রকে আমাদের অন্তর্ম্মনস্ক দেশীয় স্বভাবে যন্ত্রণা জ্ঞান করত। দেশে যদি একমাত্র যথেচ্ছাচারী বিলাসী রাজা থাকে তবে তাব সৌখীনতার আয়োজন করবার জন্যে অনেক অধমকে জীবনপাত করতে হয়, কিন্তু যখন শতসহস্র রাজা তখন মনুষ্যকে নিতান্ত দুর্ব্বহ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়্‌তে হয়। কবিবর Hood-রচিত Song of the Shirt সেই ক্লিষ্ট মানবের বিলাপ-সঙ্গীত।

খুব সম্ভব দুর্দ্দান্ত রাজার শাসনকালে ইজিপ্টেব পিরামিড অনেক-গুলি প্রস্তর এবং অনেকগুলি হতভাগ্য মানবজীবন দিয়ে রচিত হয়। এখনকার এই পরম সুন্দর অভ্রভেদী সভ্যতা দেখে' মনে হয় এও উপরে পাষাণ নীচে পাষাণ এবং মাঝখানে মানবজীবন দিয়ে গঠিত হচ্চে। ব্যাপারটা অসম্ভব প্রকাণ্ড এবং কারুকার্য্যও অপূর্ব্ব চমৎকার, তেমনি ব্যয়ও নিতান্ত অপরিমিত। সেটা বাহিরে কারো চোখে পড়ে না কিন্তু প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তব তার হিসাব জমা হচ্চে। প্রকৃতির আইন অনুসারে উপেক্ষিত ক্রমে আপনারা প্রতিশোধ নেবেই। যদি টাকার

প্রতি বহু যত্ন করে' পয়সার প্রতি নিতান্ত অনাদব করা যায় তা হ'লে সেই অনাদৃত তাম্রখণ্ড বহু যত্নের ধন গৌরাঙ্গ টাকাকে ধ্বংশ করে' ফেলে।

স্মরণ হচ্চে, য়ুরোপের কোনো এক বড লোক ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেচেন যে . ক সময়ে কাফ্রিরা য়ুরোপ জয় করবে। আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণ অমাবস্যা এসে য়ুরোপের শুভ্র দিবালোক গ্রাস করবে। প্রার্থনা করি তা না ঘটুক, কিন্তু আশ্চর্য্য কি? কারণ আলোকের মধ্যে নির্ভয়, তার উপরে সহস্র চক্ষু পড়ে' রয়েছে কিন্তু যেখানে অন্ধকার জড় হচ্চে বিপদ সেইখানে বসে' গোপনে বলসঞ্চয় করে, সেইখানেই প্রলয়ের তিমিরাবৃত জন্মভূমি। মানব-নবাবের নবাবী যখন উত্তরোত্তর অসহ্য হয়ে উঠ্বে, তখন দারিদ্র্যের অপরিচিত অন্ধকার ঈশান কোণ থেকেই ঝড় উঠ্বার সম্ভাবনা।

এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে হয়, যদিও বিদেশীয় সমাজ সম্বন্ধে কোনো কথা নিঃসংশয়ে বলা ধৃষ্টতা কিন্তু বাহির হ'তে যতটা বোঝা যায় তাতে মনে হয় য়ুরোপে সভ্যতা যত অগ্রসর হচ্চে স্ত্রীলোক ততই অসুখী হচ্চে।

স্ত্রীলোক সমাজের কেন্দ্রানুগ (Centripetal) শক্তি, সভ্যতার কেন্দ্রাতিগ শক্তি সমাজকে বহির্মুখে যে পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করে' দিচ্চে, কেন্দ্রানুগ শক্তি অন্তরের দিকে সে পরিমাণে আকর্ষণ করে' আনতে পারচে না। পুরুষেরা দেশে বিদেশে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে নিয়ত জীবিকা-সংগ্রামে নিযুক্ত হয়ে রয়েছে। সৈনিক অধিক ভার নিয়ে লড়্তে পারে না, পথিক অধিক ভার বহন করে' চল্‌তে পারে না, য়ুরোপে পুরুষ পারিবারিক ভার গ্রহণে সহজে সম্মত হয় না। স্ত্রীলোকের রাজত্ব ক্রমশ উজাড় হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। কুমারী পাত্রের অপেক্ষায় দীর্ঘকাল বসে' থাকে, স্বামী কার্য্যোপলক্ষে

চলে' যায়, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে পর হয়ে পড়ে। প্রখর জীবিকা-সংগ্রামে স্ত্রীলোকদেরও একাকিনী যোগ দেওয়া আবশ্যক হয়েছে। অথচ তাদের চিরকালের শিক্ষা স্বভাব এবং সমাজনিয়ম তার প্রতিকূলতা করচে।

য়ুরোপে স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার প্রাপ্তির যে চেষ্টা করচে সমাজের এই সমাঞ্জস্যনাশই তার কারণ বলে' বোধ হয়। নরোয়েদেশীয় প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইবসেন-রচিত কতকগুলি সামাজিক নাটকে দেখা যায় নাট্যোক্ত অনেক স্ত্রীলোক প্রচলিত সমাজবন্ধনের প্রতি একান্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করচে অথচ পুরুষেরা সমাজপ্রথার অনুকূলে। এই রকম বিপরীত ব্যাপার পড়ে' আমার মনে হ'ল, বাস্তবিক, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থাই নিতান্ত অসঙ্গত। পুরুষেরা না তাদের গৃহপ্রতিষ্ঠা করে' দেবে, না তাদের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ণাধিকার দেবে। রাশিয়ার নাইহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে এত স্ত্রীলোকের সংখ্যা দেখে' আপাতত আশ্চর্য্য বোধ হয়। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে য়ুরোপে স্ত্রীলোকের প্রলয়মূর্ত্তি ধরবার অনেকটা সময় এসেছে।

অতএব সবসুদ্ধ দেখা যাচ্চে, য়ুরোপীয় সভ্যতায় সর্ব্ব বিষয়েই প্রবলতা এমনি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে যে, অসমর্থ পুরুষই বল আর অবলা রমণীই বল, দুর্ব্বলদের আশ্রয় স্থান এ-সমাজে যেন ক্রমশই লোপ হয়ে যাচ্চে। এখন কেবলি কার্য্য চাই, কেবলি শক্তি চাই, কেবলি গতি চাই; দয়া দেবার এবং দয়া নেবার, ভালবাস্‌বার এবং ভালবাসা পাবার যারা যোগ্য তাদের এখানে যেন সম্পূর্ণ অধিকার নেই। এই জন্যে স্ত্রীলোকেরা যেন তাদের স্ত্রীস্বভাবের জন্যে লজ্জিত। তারা বিধিমতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করচে যে, আমাদের কেবল যে হৃদয় আছে তা নয়, আমাদের বলও আছে। অতএব "আমি কি ডরাই সখি

ভিখারী রাখবে?" হায়, আমরা ইংরাজশাসিত বাঙালিরাও সেইভাবেই বল্‌চি, "নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে?"

এই ত অবস্থা। কিন্তু ইতিমধ্যে যখন ইংলণ্ডে আমাদের স্ত্রী-লোকদের দুরবস্থার উল্লেখ করে' মুষলধারায় অশ্রুবর্ষণ হয় তখন এতটা অজস্র করুণা বৃথা নষ্ট হচ্চে বলে' মনে অত্যন্ত আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ইংরাজের মুল্লুকে আমরা অনেক আইন এবং অনেক আদালত পেয়েছি। দেশে যত চোর আছে পাহারাওয়ালার সংখ্যা তার চেয়ে ঢের বেশি। সুনিয়ম সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে কথাটি কবার যো নেই। ইংরাজ আমাদের সমস্ত দেশটিকে ঝেড়ে ঝুড়ে ধুয়ে নিংড়ে ভাঁজ করে' পাট করে' ইস্ত্রি করে' নিজের বাক্সর মধ্যে পূরে তার উপর জগদ্দল হয়ে চেপে বসে' আছে। আমরা ইংরাজের সতর্কতা, সচেষ্টতা, প্রখর বুদ্ধি, সুশৃঙ্খল কর্ম্মপটুতার অনেক পরিচয় পেয়ে থাকি, যদি কোনো কিছুর অভাব অনুভব করি তবে সে এই স্বর্গীয় করুণার, নিরুপায়ের প্রতি ক্ষমতা-শালীর অবজ্ঞাবিহীন অনুকূল প্রসন্নভাবের। আমরা উপকার অনেক পাই, কিন্তু দয়া কিছুই পাইনে। অতএব যখন এই দুর্লভ করুণার অস্থানে অপব্যয় দেখি তখন ক্ষোভের আর সীমা থাকে না।

আমরা ত দেখ্‌তে পাই আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের সুগোল কোমল দুটি বাহুতে দু'গাছি বালা পরে' সিঁথের মাঝখানটিতে সিঁদুরের রেখা কেটে' সদাপ্রসন্নমুখে স্নেহ প্রেম কল্যাণে আমাদের গৃহ মধুর করে' রেখেছেন। কখনো কখনো অভিমানের অশ্রুজলে তাদের নয়নপল্লব আর্দ্র হয়ে আসে, কখনো বা ভালবাসার গুরুতর অত্যাচারে তাঁদের সরল সুন্দর মুখশ্রী ধৈর্য্যগম্ভীর সকরুণ বিষাদে ম্লানকান্তি ধারণ করে, কিন্তু রমণীর অদৃষ্টক্রমে দুর্ব্বৃত্ত স্বামী এবং অকৃতজ্ঞ সন্তান পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে, বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায় ইংলণ্ডেও তার অভাব নেই। যা' হোক্, আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিয়ে আমরা

ত বেশ সুখে আছি এবং তাঁরা যে বড় অসুখী আছেন এমনতর আমাদের কাছে ত কখনো প্রকাশ করেন নি, মাঝের থেকে সহস্র ক্রোশ দূরে লোকের অনর্থক হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় কেন?

পরস্পরের সুখদুঃখ সম্বন্ধে লোকে স্বভাবতই অত্যন্ত ভুল করে' থাকেন! মৎস্য যদি উত্তরোত্তর সভ্যতার বিকাশে সহসা মানব-হিতৈষী হয়ে উঠে, তা হ'লে সমস্ত মানব-জাতিকে একটা শৈবালবহুল গভীর সরোবরের মধ্যে নিমগ্ন না করে' কিছুতে কি তার করুণ হৃদয়ের উৎকণ্ঠা দূর হয়? তোমরা বাহিরে সুখী আমরা গৃহে সুখী. এখন আমাদের সুখ তোমাদের বোঝাই কি করে'?

একজন লেডি-ডফারিন্-স্ত্রীডাক্তার আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে' যখন দেখে, অপরিচ্ছন্ন ছোট কুঠরি; ছোট ছোট জানলা; বিছানাটা নিতান্ত দুগ্ধফেননিভ নয়, মাটির প্রদীপ, দড়িবাঁধা মশারি, আর্ট্ষ্টুডিয়োর রং-লেপা ছবি, দেয়ালের গাত্রে দীপশিখার কলঙ্ক এবং বহুজনের বহুদিনের মলিন করতলের চিহ্ন—তখন সে মনে করে কি সর্ব্বনাশ, কি ভয়ানক কষ্টের জীবন, এদের পুরুষেরা কি স্বার্থপর, স্ত্রীলোকদের জন্তুর মত করে' রেখেচে। জানে না আমাদের দশাই এই। আমরা মিল পড়ি, স্পেন্সর পড়ি, রস্কিন পড়ি, আপিসে কাজ করি, খবরের কাগজে লিখি, বই ছাপাই, ঐ মাটির প্রদীপ জ্বালি, ঐ মাদুরে বসি, অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হ'লে অভিমানিনী সহধর্ম্মিণীর গহনা গড়িয়ে দিই, এবং ঐ দড়িবাঁধা মোটা মশারির মধ্যে আমি, আমার স্ত্রী এবং মাঝখানে একটি কচি খোকা নিয়ে তালপাতার হাত-পাখা খেয়ে রাত্রিযাপন করি।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তবু আমরা নিতান্ত অধম নই। আমাদের কৌচ্ কার্পেট্ কেদারা নেই বল্লেই হয়, কিন্তু তবুও ত আমাদের দয়ামায়া ভালবাসা আছে। তক্তপোষের উপর অর্দ্ধশয়ান-অবস্থায় এক

হাতে তাকিয়া আঁকড়ে ধরে' তোমাদের সাহিত্য পড়ি, তব্‌ও ত অনেকটা বুঝ্‌তে পারি এবং সুখ পাই ; ভাঙ্গা প্রদীপে খোলা গায়ে তোমাদের ফিলজাফি অধ্যয়ন করে' থাকি তবু তার থেকে এত বেশি আলো পাই যে, আমাদের ছেলেরাও অনেকটা তোমাদেরই মত বিশ্বাসবিহীন হয়ে আসচে।

আমরাও আবার তোমাদের ভাব বুঝ্‌তে পারি নে। কৌচ্‌ কেদারা খেলাধূলা তোমরা এত ভালবাস যে স্ত্রী-পুত্র না হ'লেও তোমাদের বেশ চলে' যায়। আরামটি তোমাদের আগে, তার পরে ভালবাসা ; আমাদের ভালবাসা নিতান্তই আবশ্যক, তার পরে প্রাণপণ চেষ্টায় ইহজীবনে কিছুতেই আর আরামের যোগাড় হয়ে ওঠে না।

অতএব, আমরা যখন বলি, আমরা যে বিবাহ করে' থাকি সেটা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে পারত্রিক মুক্তি সাধনের জন্য, কথাটা খুব জাঁকালো শুনতে হয় কিন্তু তবু সেটা মুখের কথা মাত্র এবং তার প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্য আমাদের বর্ত্তমান সমাজ পরিত্যাগ করে' প্রাচীন পুঁথির পাতার মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ব্যস্তভাবে গবেষণা করে' বেড়াতে হয়। প্রকৃত সত্য কথাটা হচ্চে ও না হ'লে আমাদের চলে না—আমরা থাকৃতে পারিনে। আমরা শুশুকের মত কর্ম্মতরঙ্গের মধ্যে দিগ্বাজি খেলে' বেড়াই বটে কিন্তু চট্‌ করে' অম্‌নি যখনতখন অন্তঃপুরের মধ্যে হুস্‌ করে' হাফ ছেড়ে না এলে আমরা বাচিনে। যিনি যাই বলুন সেটা পারলৌকিক সদ্গতির জন্যে নয়!

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজের ভাল হচ্চে কি মন্দ হচ্চে সে কথা এখানে বিচার্য্য নয়, সে-কথা নিয়ে অনেক বাদ প্রতিবাদ হয়ে গেছে। এখানে কথা হচ্ছিল, আমাদের স্ত্রীলোকেরা সুখী কি অসুখী। আমার মনে হয় আমাদের সমাজের যে রকম গঠন, তাতে সমাজের ভালমন্দ যাই হোক্‌ আমাদের স্ত্রীলোকেরা বেশ একরকম সুখে আছে।

ইংরাজেরা মনে করতে পারেন লনটেনিস্ না খেল্‌লে এবং "বলে" না নাচ্‌লে স্ত্রীলোক সুখী হয় না, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস, ভালবেসে এবং ভালবাসা পেয়েই স্ত্রীলোকেব প্রকৃত সুখ। তবে সেটা একটা কুসংস্কার হ'তেও পাবে।

আমাদের পরিবারে নারী-হৃদয় যেমন বিচিত্রভাবে চরিতার্থতা লাভ করে এমন ইংবাজ-পরিবারে অসম্ভব। এই জন্যে একজন ইংরাজ-মেয়ের পক্ষে চিরকুমারী হওয়া দারুণ দুরদৃষ্টতা। তাদের শূন্যহৃদয় ক্রমশ নীরস হয়ে আসে, কেবল কুকুরশাবক পালন করে' এবং সাধারণ হিতার্থে সভা পোষণ করে' আপনাকে ব্যাপৃত রাখ্‌তে চেষ্টা করে। যেমন মৃতবৎসা প্রসূতির সঞ্চিত স্তন্য কৃত্রিম উপায়ে নিষ্ক্রান্ত করে' দেওয়া তার স্বাস্থ্যের পক্ষে আবশ্যক তেমনি য়ুরোপীয় চিরকুমারীব নারীহৃদয়সঞ্চিত স্নেহরস নানা কৌশলে নিষ্ফল ব্যয় করতে হয়, কিন্তু তাতে তাদেব আত্মার প্রকৃত পরিতৃপ্তি হ'তে পারে না।

ইংরাজ Old maid-এর সঙ্গে আমাদের বালবিধবাব তুলনা বোধ হয় অন্যায় হয় না। সংখ্যায় বোধ করি ইংবাজ কুমারী এবং আমাদের বালবিধবা সমান হবে কিম্বা কিছু যদি কমবেশ হয়। বাহ্য সাদৃশ্যে আমাদের বিধবা য়ুরোপীয় চিরকুমারীর সমান হ'লেও প্রধান একটা বিষয়ে প্রভেদ আছে। আমাদের বিধবাব নারীপ্রকৃতি কখনো শুষ্ক শস্য পতিত থেকে অনুর্ব্বরতা লাভের অবসর পায় না। তার কোল কখনো শূন্য থাকে না, বাহু দুটি কখনো অকর্ম্মণ্য থাকে না, হৃদয় কখনো উদাসীন থাকে না। তিনি কখনো জননী, কখনো দুহিতা, কখনো সখী। এই জন্যে চিরজীবনই তিনি কোমল সরস স্নেহশীল সেবা-তৎপর হয়ে থাকেন। বাড়ির শিশুরা তাঁরই চোখের সাম্‌নে জন্মগ্রহণ করে এবং তাঁরই কোলে কোলে বেড়ে ওঠে। বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তাঁর বহুকালের সুখ দুঃখময় প্রীতির সখিত্ব বন্ধন, বাড়িব

পুরুষদের সঙ্গে স্নেহভক্তিপরিহাসের বিচিত্র সম্বন্ধ ; গৃহকার্য্যের ভার যা স্বভাবতই মেয়েরা ভালবাসে তাও তার অভাব নেই। এবং ওরি মধ্যে রামায়ণ মহাভারত দুটো একটা পুরাণ পড়্‌বার কিম্বা শোন্‌বার সময় থাকে, এবং সন্ধ্যাবেলায় ছোট ছোট ছেলেদের কোলের কাছে টেনে নিয়ে উপকথা বলাও একটা স্নেহের কাজ বটে। বরং একজন বিবাহিত রমণীর বিড়াল শাবক এবং ময়না পোষ্‌বার প্রবৃত্তি এবং অবসর থাকে কিন্তু বিধবাদের হাতে হৃদয়ের সেই অতিরিক্ত কোণটুকুও উদ্বৃত্ত থাক্‌তে প্রায় দেখা যায় না।

এই সকল কারণে, তোমাদের যে-সকল মেয়ে প্রমোদের আবর্ত্তে অহর্নিশি ঘূর্ণ্যমান কিম্বা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত, কিম্বা দু'টো একটা কুকুর শাবক এবং চারটে পাঁচটা সভা কোলে করে' একাকিনী কৌমার্য্য কিম্বা বৈধব্য যাপনে নিরত তাঁদের চেয়ে যে আমাদের অন্তঃপুরচারিণীরা অসুখী এ-কথা আমার মনে লয় না। ভালবাসাহীন বন্ধনহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক—মরুভূমির মধ্যে অপর্য্যাপ্ত স্বাধীনতা গৃহীলোকের পক্ষে যেমন ভীষণ শূন্য।

আমরা আর যা'ই হই, আমরা গৃহস্থ জাতি ; অতএব বিচার করে' দেখ্‌তে গেলে আমরা আমাদের রমণীদের দ্বারেই অতিথি ; তাঁরাই আমাদের সর্ব্বদা বহু যত্ন আদর করে' রেখে দিয়েচেন। এম্‌নি আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে' নিয়েছেন যে আমরা ঘর ছেড়ে দেশ ছেড়ে দু'দিন টিঁক্‌তে পারিনে ; তাতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয় সন্দেহ নেই কিন্তু তাতে করে' নারীরা অসুখী হয় না।

আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে যে কিছুই করবার নেই, আমাদের সমাজ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বসম্পূর্ণ এবং আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা তার একটা প্রমাণ, এ-কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। আমাদের রমণীদের শিক্ষার অঙ্গহীনতা আছে এবং অনেক বিষয়ে তাঁদের

শরীর মনের সুখ সাধন করাকে আমরা উপেক্ষা এবং উপহাসযোগ্য জ্ঞান করি। এমন কি, রমণীদের গাড়িতে চড়িয়ে স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন করানকে আমাদের দেশের পরিহাস-রসিকেরা একটা পরম হাস্যরসের বিষয় বলে' স্থির করেন, কিন্তু তবুও মোটের উপর বলা যায় আমাদের স্ত্রী কন্যারা সর্ব্বদাই বিভীষিকা রাজ্যে বাস করচেন না, এবং তারা সুখী।

তাদের মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে এই প্রশ্ন ওঠে, আমরা পুরুষেরাই কি খুব বেশি শিক্ষিত? আমরা কি একরকম কাঁচা পাকা জোড়া-তাড়া অদ্ভুত ব্যাপার নই? আমাদের কি পর্য্যবেক্ষণশক্তি বিচারশক্তি এবং ধারণাশক্তির বেশ সুস্থ সহজ এবং উদার পরিণতি লাভ হয়েছে? আমরা কি সর্ব্বদাই পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে অপ্রকৃত কল্পনাকে মিশ্রিত করে' ফেলিনে, এবং অন্ধসংস্কার কি আমাদের বুদ্ধিরাজ্যসিংহাসনের অর্দ্ধেক অধিকার করে' সর্ব্বদাই অটল এবং দাম্ভিকভাবে বসে' থাকে না? আমাদের এই রকম দুর্ব্বল শিক্ষা এবং দুর্ব্বল চরিত্রের জন্য সর্ব্বদাই কি আমাদের বিশ্বাস এবং কার্য্যের মধ্যে একটা অদ্ভুত অসঙ্গতি দেখা যায় না? আমাদের বাঙালীদের চিন্তা এবং মত এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে কি এক প্রকার শৃঙ্খলাসংযমহীন বিষম বিজড়িত ভাব লক্ষিত হয় না?

আমরা সুশিক্ষিতভাবে দেখ্‌তে শিখিনি ভাব্‌তে শিখিনি কাজ কর্‌তে শিখিনি, সেই জন্যে আমাদের কিছুর মধ্যেই স্থিরত্ব নেই— আমরা যা বলি যা করি সমস্ত খেলার মত মনে হয়, সমস্ত অকাল মুকুলের মত ঝরে' গিয়ে মাটি হয়ে যায়। সেই জন্যে আমাদের রচনা ডিবেটিং-ক্লাবের 'এসে'র মত, আমাদের মতামত সূক্ষ্ম তর্কচাতুরী প্রকাশের জন্য, জীবনের ব্যবহারের জন্য নয়, আমাদের বুদ্ধি কুশাঙ্কুরের মত তীক্ষ্ণ কিন্তু তাতে অস্ত্রের বল নেই। আমাদেরই যদি এই দশা ত আমাদের

স্ত্রীলোকদের যতই বা শিক্ষা হবে। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই সমাজের যে অন্তরের স্থান অধিকার করে' থাকেন সেখানে পাক ধরতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। য়ুরোপের স্ত্রীলোকদের অবস্থা আলোচনা করলেও তাই দেখা যায়। অতএব আমাদের পুরুষদের শিক্ষার বিকাশ হবার পূর্ব্বেই যদি আমাদের অধিকাংশ নারীদের শিক্ষার সম্পূর্ণতা প্রত্যাশা করি তা'হলে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়ার প্রয়াস প্রকাশ পায়।

তবে এ কথা বলতেই হয় ইংরাজস্ত্রীলোক অশিক্ষিত থাকলে যেটা অসম্পূর্ণ স্বভাব থাকে আমাদের পরিপূর্ণ গৃহের প্রসাদে আমাদের রমণীর জীবনের শিক্ষা সহজেই তার চেয়ে অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করে।

কিন্তু এই বিপুল গৃহের ভারে আমাদের জাতির আর বৃদ্ধি হ'তেই পেলে না। গার্হস্থ্য উত্তরোত্তর এমনি অসম্ভব প্রকাণ্ড হয়ে পড়েছে যে নিজ গৃহের বাহিরের জন্যে আর কারো কোনো শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। অনেক গুলোয় একত্রে জড়ীভূত হয়ে সকলকেই সমান খর্ব্ব করে' রেখে দেয়। সমাজটা অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট একটা জঙ্গলের মত হয়ে যায় তার সহস্র বাধাবন্ধনের মধ্যে কোনো একজনের মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠা বিষম শক্ত হয়ে পড়ে।

এই ঘনিষ্ঠ পরিবারের বন্ধনপাশে পড়ে' এদেশে জাত হয় না, দেশ হয় না, বিশ্ববিজয়ী মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পায় না। পিতামাতা হয়েছে, পুত্র হয়েছে, ভাই হয়েছে, স্ত্রী হয়েছে, এবং এই নিবিড় সমাজশক্তির প্রতিক্রিয়াবশে অনেক বৈরাগী সন্ন্যাসীও হয়েছে কিন্তু বৃহৎ সংসারের জন্যে কেউ জন্মেনি —পরিবারকেই আমরা সংসার বলে' থাকি।

কিন্তু য়ুরোপে আবার আর এক কাণ্ড দেখা যাচ্চে। য়ুরোপীয়ের গৃহবন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল বলে' তাঁদের মধ্যে অনেকে যেমন সমস্ত ক্ষমতা স্বজাতি কিম্বা মানবহিতব্রতে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন তেমনি আরেকদিকে অনেকেই সংসারের মধ্যে কেবলমাত্র নিজেকেই

লালন পালন পোষণ করবার সুদীর্ঘ অবসর এবং সুযোগ পাচ্চেন একদিকে যেমন বন্ধনহীন পরহিতৈষা আর একদিকেও তেমনি বাধা বিহীন স্বার্থপরতা। আমাদের যেমন প্রতিবৎসর পরিবার বাড়্‌চে, ওদের তেমনি প্রতিবৎসর আরাম বাড়্‌চে। আমরা বলি যাবৎ দারপরিগ্রহ না হয় তাবৎ পুরুষ অর্দ্ধেক, ইংরাজ বলে যতদিন একটি ক্লাব না জোটে ততদিন পুরুষ অর্দ্ধাঙ্গ, আমরা বলি সন্তানে গৃহ পবিত্র না হ'লে গৃহ শ্মশানসমান, ইংরাজ বলেন আসবাব্ অভাবে গৃহ শ্মশানতুল্য।

সমাজে একবার যদি এই বাহ্যসম্পদকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয় তবে সে এমনি প্রভু হয়ে বসে যে, তার হাত আর সহজে এড়াবার জো থাকে না। তবে ক্রমে সে গুণের প্রতি অবজ্ঞা এবং মহত্ত্বের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করতে আরম্ভ করে। সম্প্রতি এদেশেও তার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ডাক্তারিতে যদি কেহ পসার করতে ইচ্ছা করেন, তবে তার সর্ব্বাগ্রেই জুড়ি গাড়ি এবং বড় বাড়ীর আবশ্যক, এই জন্যে অনেক সময়ে রোগীকে মারতে আরম্ভ করবার পূর্ব্বে নবীন ডাক্তার নিজে মরতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাদের কবিরাজ মহাশয় যদি চটি এবং চাদর প'রে' পায়া অবলম্বনপূর্ব্বক যাতায়াত করেন তা'তে তাঁর পসারের ব্যাঘাত করে না। কিন্তু একবার যদি গাড়ি ঘোড়া ঘাড় ঘাড়র চেনকে আমল দেওয়া হয় তবে সমস্ত চরক সুশ্রুত ধন্বন্তরীর সাধ্য নেই যে, আর তার হাত থেকে পরিত্রাণ করে। ইন্দ্রিয়সূত্রে জড়ের সঙ্গে মানুষের একটা ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা আছে, সেই সুযোগে সে সর্ব্বদাই আমাদের কর্ত্তা হয়ে উঠে। এই জন্যে প্রতিমা প্রথমে ছল করে' মন্দিরে প্রবেশ করে তার পরে দেবতাকে অতিষ্ঠ করে' তোলে। গুণের বাহ্য নিদর্শনস্বরূপ হয়ে ঐশ্বর্য্য দেখা দেয় অবশেষে বাহ্যাড়ম্বরের অনুবর্ত্তী হয়ে না এলে গুণের আর সম্মান থাকে না।

বেগবতী মহানদী নিজে বালুকা সংগ্রহ করে' এনে অবশেষে নিজের পথরোধ করে' বসে। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সেই রকম প্রবল নদী বলে' এক একবার মনে হয়। তার বেগের বলে, মানুষের পক্ষে যা সামান্য আবশ্যক এমন সকল বস্তুও চতুর্দ্দিক থেকে আনীত হয়ে রাশীকৃত হয়ে দাঁড়াচ্চে। সভ্যতার প্রতিবর্ষের আবর্জ্জনা পর্ব্বতাকার হয়ে উঠ্‌চে। আর আমাদের সঙ্কীর্ণ নদীটি নিতান্ত ক্ষীণ স্রোত ধারণ করে' অবশেষে মধ্যপথে পারিবারিক ঘন শৈবালজালের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে আচ্ছন্নপ্রায় হয়ে গেছে। কিন্তু তারো একটি শোভা সরসতা শ্যামলতা আছে। তার মধ্যে বেগ নেই, বল নেই, ব্যাপ্তি নেই, কিন্তু মৃদুতা স্নিগ্ধতা সহিষ্ণুতা আছে।

আর, যদি আমার আশঙ্কা সত্য হয়, তবে য়ুরোপীয় সভ্যতা হয়ত বা তলে তলে জড়ত্বের এক প্রকাণ্ড মরুভূমি সৃজন করচে, গৃহ, যা মানুষের স্নেহ প্রেমের নিভৃত নিকেতন, কল্যাণের চিরউৎসভূমি, পৃথিবীর আর সমস্তই লুপ্ত হয়ে গেলেও যেখানে একটুখানি স্থান থাকা মানুষের পক্ষে চরম আবশ্যক স্তূপাকার বাহ্যবস্তুর দ্বারা সেই খানটা উত্তরোত্তর ভরাট করে' ফেল্‌চে, হৃদয়ে জন্মভূমি জড় আবরণে কঠিন হয়ে উঠ্‌চে।

যা হোক্‌, আমার মত অভাজন লোকের পক্ষে য়ুরোপীয় সভ্যতার পরিণাম অন্বেষণের চেষ্টা অনেকটা আদার ব্যাপারীর জাহাজের তথ্য নেওয়ার মত হয়। তবে একটা নির্ভয়ের কথা এই যে, আমি যে কোনো অনুমানই ব্যক্ত করি না কেন, তার সত্য মিথ্যা পরীক্ষার এত বিলম্ব আছে যে ততদিনে আমি এখানকার দণ্ড পুরস্কারের হাত এড়িয়ে বিস্মৃতি-রাজ্যে অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করব। অতএব এ-সকল কথা যিনি যে ভাবেই নিন আমি তার জবাবদিহি করতে চাই না। কিন্তু য়ুরোপের স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে কথাটা বল্‌ছিলুম সেটা নিতান্ত অবজ্ঞার যোগ্য বলে' আমার বোধ হয় না।

যে দেশে গৃহ নষ্ট হয়ে ক্রমে হোটেল বৃদ্ধি হচ্চে, যে যাব নিজে নিজে উপার্জ্জন কবচে এবং আপনাব ঘবটি, Easy chairটি, কুকুরটি, ঘোড়াটি, বন্দুকটি, *চুরটেব পাইপটি এবং জুয়াখেলবাব ক্লাবটি নিয়ে নির্ব্বিঘ্ন আবামেব চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছে সেখানে নিশ্চয়ই মেয়েদের মৌচাক ভেঙ্গে গেছে। পূর্ব্বে সেবক-মক্ষিকারা মধু অন্বেষণ করে' চাকে সঞ্চয় কবত এবং রাজ্ঞী মক্ষিকাবা কর্ত্তৃত্ব কবতেন, এখন স্বার্থপবগণ যে-যার নিজেব নিজেব চাক ভাড়া করে' সকালে মধু উপার্জ্জনপূর্ব্বক সন্ধ্যাপর্য্যন্ত একাকী নিঃশেষে উপভোগ কবচে। সুতবাং বাণী মক্ষিকাদের এখন বেরোতে হচ্ছে, কেবলমাত্র মধুদান এবং মধুপান কববাব আর সময় নেই। বর্ত্তমান অবস্থা এখনো তাঁদেব স্বাভাবিক হয়ে যায়নি এই জন্যে অনেকটা পরিমাণে অসহায়ভাবে তাঁবা ইতস্তত ভন ভন কবে' বেড়াচ্চেন। আমবা আমাদেব মহারাণীদেব রাজত্বে বেশ আছি এবং তাঁরাও আমাদের অন্তঃপুব অর্থাৎ আমাদের পাবিবারিক সমাজেব মর্ম্ম স্থানটি অধিকাব করে' সকল ক'টিকে নিয়ে বেশ সুখে আছেন।

কিন্তু সম্প্রতি সমাজেব নানা বিষয়ে অবস্থান্তব ঘটচে। দেশের আর্থিক অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন হয়েছে যে জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতই ভিন্ন আকার ধাবণ কবচে এবং সেই সূত্রে আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবাব কালক্রমে কথঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হবার মত বোধ হচ্চে। সেই সঙ্গে ক্রমশ আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা পরিবর্ত্তন আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। কেবলমাত্র গৃহলুণ্ঠিত কোমল হৃদয়রাশি হয়ে থাকলে চলবে না, মেরুদণ্ডের উপব ভব করে' উন্নত উৎসাহী ভাবে স্বামীব পার্শ্ব চারিণী হ'তে হবে।

অতএব স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হ'লে বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে, ইংরাজি যে জানে এবং ইংরাজি যে জানে না তাহাদের মধ্যে

একটা জাতিভেদের মত দাঁড়াচ্চে, অতএব অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বরকন্যার মধ্যে যথার্থ অসবর্ণ বিবাহ হচ্চে। একজনের চিন্তা, চিন্তাব ভাষা, বিশ্বাস এবং কাজ আর এক জনেব সঙ্গে কিস্তব বিভিন্ন। এই জন্যে আমাদের আধুনিক দাম্পত্যে অনেক প্রহসন এবং সম্ভবত অনেক ট্র্যাজেডিও ঘটে' থাকে। স্বামী যেখানে ঝাঁঝালো সোডাওয়াটাব চায়, স্ত্রী সেখানে সুশীতল ডাবের জল এনে উপস্থিত করে।

এই জন্যে সমাজে স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশই প্রচলিত হচ্চে, কারো বক্তৃতায় নয়, কর্ত্তব্যজ্ঞানে নয়, আবশ্যকের বশে।

এখন, অন্তরে বাহিবে এই ইংরাজি শিক্ষা প্রবেশ কবে' সমাজের অনেক ভাবান্তর উপস্থিত কববেই সন্দেহ নেই। কিন্তু যারা আশঙ্কা করেন আমরা এই শিক্ষার প্রভাবে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে প্রাচ্যলীলা সম্বরণ করে' পরম পাশ্চাত্যলোক লাভ কবব—আমার আশা এবং আমার বিশ্বাস তাঁদের সে আশঙ্কা ব্যর্থ হবে।

কারণ, যেমন শিক্ষাই পাই না কেন, আমাদের একেবারে রূপান্তর হওয়া অসম্ভব। ইংরাজি শিক্ষা আমাদের কেবল কতকগুলি ভাব এনে দিতে পারে কিন্তু তার সমস্ত অনুকূল অবস্থা এনে দিতে পারে না। ইংবাজি সাহিত্য পেতে পারি কিন্তু ইংলণ্ড পাব কোথা থেকে। বীজ পাওয়া যায় কিন্তু মাটি পাওয়াই কঠিন।

দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখানো যেতে পারে, বাইবল্ যদিও বহুকাল হ'তে য়ুরোপের প্রধান শিক্ষার গ্রন্থ, তথাপি য়ুরোপ আপন অসহিষ্ণু দুর্দ্দান্ত ভাব রক্ষা করে' এসেছে, বাইবেলের ক্ষমা এবং নম্রতা এখনো তাদের অন্তরকে গলাতে পারেনি।

আমার ত বোধ হয় যুরোপের পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে যুরোপ বাল্যকাল হ'তে এমন একটি শিক্ষা পাচ্চে যা তার প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুযায়ী নয়, যা তার সহজ স্বভাবের কাছে নূতন অধিকার

এনে দিচ্চে, এবং সর্ব্বদা সংঘাতের দ্বারা তাকে মহত্ত্বের পথে জাগ্রত করে’ রাখ্‌চে।

য়ুরোপ কেবল যদি নিজের প্রকৃতি অনুসারিণী শিক্ষা লাভ করত তাহ’লে য়ুরোপের আজ এমন উন্নতি হ’ত না। তাহ’লে য়ুরোপের সভ্যতার মধ্যে এমন ব্যাপ্তি থাক্‌ত না, তাহ’লে একই উদারক্ষেত্রে এত ধর্ম্মবীর এবং কর্ম্মবীরের অভ্যুদয় হ’ত না। খৃষ্টধর্ম্ম সর্ব্বদাই য়ুরোপের স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য, মন এবং আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে’ রেখেছে।

খৃষ্টীয় শিক্ষা কেবল যে তলে তলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে আধ্যাত্মিক রসের সঞ্চার করচে তা নয়, তার মানসিক বিকাশের কত সহায়তা করেছে বলা যায় না। য়ুরোপের সাহিত্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাইব্‌ল্‌-সহযোগে প্রাচ্যভাব প্রাচ্যকল্পনা য়ুরোপের হৃদয়ে স্থান লাভ করে’ সেখানে কত কবিত্ব কত সৌন্দর্য্য বিকাশ করেছে; উপদেশের দ্বারায় নয় কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় ভাবের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবের দ্বারায় তার হৃদয়ের সার্ব্বজনীন অধিকার যে কত বিস্তৃত করেছে তা আজ কে বিশ্লেষ করে’ দেখাতে পারে?

সৌভাগ্যক্রমে আমরা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্চি তাও আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগত নয়। এই জন্যে আশা করচি এই নূতন শক্তির সমাগমে আমাদের বহুকালের একভাবাপন্ন জড়ত্ব পরিহার কর্‌তে পারব, নব-জীবনহিল্লোলের স্পর্শে সজীবতা লাভ করে’ পুনরায় নবপত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠব, আমাদের মানসিক রাজ্য সুদূরবিস্তৃতি লাভ করতে পার্‌বে।

কেহ কেহ বলেন য়ুরোপের ভাল য়ুরোপের পক্ষেই ভাল, আমাদের ভাল আমাদেরই ভাল। কিন্তু কোনো প্রকৃত ভাল কখনই পরস্পরের প্রতিযোগী নয় তারা সহযোগী। অবস্থা-বশত আমরা কেহ একটাকে কেহ আর একটাকে প্রাধান্য দিই, কিন্তু মানবের সর্ব্বাঙ্গীন হিতের

প্রতি দৃষ্টি করলে কাউকেই দূর করে' দেওয়া যায় না। এমন কি, সকল ভালর মধ্যেই এমন একটি পারিবারিক বন্ধন আছে যে একজনকে দূর কবলেই আর একজন দুর্ব্বল হয় এবং অঙ্গহীন মনুষ্যত্ব ক্রমশ আপনার গতি বন্ধ করে' সংসারপথপার্শ্বে একস্থানে স্থিতি অবলম্বন কবতে বাধ্য হয় এবং এই নিরুপায় স্থিতিকেই উন্নতিব চূড়ান্ত পরিণাম বলে' আপনাকে ভোলাতে চেষ্টা করে।

গাছ যদি সহসা বুদ্ধিমান কিংবা অত্যন্ত সহৃদয় হয়ে ওঠে তাহ'লে সে মনে মনে এমন তর্ক করতে পাবে যে, মাটিই আমার জন্মস্থান অতএব কেবল মাটির রস আকর্ষণ কবে'ই আমি বাচ্‌ব। আকাশের রৌদ্রবৃষ্টি 'আমাকে ভুলিয়ে আমার মাতৃভূমি থেকে আমাকে ক্রমশই আকাশের দিকেই নিয়ে যাচ্চে, অতএব আমরা নব্যতরুসম্প্রদায়েরা একটা সভা কবে' এই সতত চঞ্চল পবিবর্ত্তনশীল রৌদ্রবৃষ্টি বায়ুর সংস্পর্শ বহুপ্রযত্নে পবিহারপূর্ব্বক আমাদের ধ্রুব অটল সনাতন ভূমির একান্ত আশ্রয় গ্রহণ করব।

কিম্বা সে এমন তর্কও করতে পারে যে ভূমিটা অত্যন্ত স্থূল, হেয় এবং নিম্নবর্ত্তী, অতএব তার সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা না রেখে আমি চাতক পক্ষীর মত কেবল মেঘের মুখ চেয়ে থাকব—দুয়েতেই প্রকাশ পায় বৃক্ষেব পক্ষে যতটা আবশ্যক তাব চেযে তার অনেক অধিক বুদ্ধির সঞ্চার হয়েছে।

তেমনি বর্ত্তমান কালে যাঁরা বলেন আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে বাহিরের শিক্ষা হ'তে আপনাকে রক্ষা করবার জন্যে আপাদ-মস্তক আচ্ছন্ন করে' বসে' থাকব, কিম্বা যাঁবা বলেন হঠাৎ-শিক্ষার বলে আমরা আতসবাজির মত এক মুহূর্ত্তে ভারতভূতল পরিত্যাগ করে' সুদূর উন্নতির জ্যোতিষ্ক-লোকে গিয়ে হাজির হব তাঁরা' উভয়েই অনাবশ্যক কল্পনা নিয়ে অতিরিক্ত বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ করচেন।

কিন্তু সহজ-বুদ্ধিতে স্বভাবতই মনে হয় যে, ভাবতবর্ষ থেকে শিকড় উৎপাটন করে'ও আমরা বাঁচ্‌বনা এবং যে ইংরাজি শিক্ষা আমাদেব চতুর্দ্দিকে নানা আকারে বর্ষিত ও প্রবাহিত হচ্চে তাও আমাদের শিরোধার্য্য করে' নিতেই হবে। মধ্যে মধ্যে দুটো একটা বজ্রও পড়্‌তে পারে এবং কেবলি যে বৃষ্টি হবে তা নয়, কখন কখন শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বিমুখ হয়ে যাব কোথায়? তা ছাড়া এটাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য এই যে নূতন বর্ষার বারিধারা এতে আমাদেব সেই প্রাচীন ভূমির মধ্যেই নবজীবন সঞ্চার কবচে।

অতএব ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের কি হবে? আমরা ইংরাজ হব না, কিন্তু আমবা সবল হব উন্নত হব জীবন্ত হব। মোটের উপরে আমরা এই গৃহপ্রিয় শান্তিপ্রিয় জাতিই থাক্‌ব, তবে এখন যেমন "ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ" তেমনটা থাক্‌বে না। আমাদের বাহিরেও বিশ্ব আছে সে-বিষয়ে আমাদের চেতনা হবে। আপনার সঙ্গে পরের তুলনা করে' নিজের যদি কোনো বিষয়ে অনভিজ্ঞ গ্রাম্যতা কিম্বা অতিমাত্র বাড়াবাড়ি থাকে তবে সেটা অদ্ভুত হাস্যকর অথবা দূষনীয় বলে' ত্যাগ করতে পারব। আমাদের বহুকালের রুদ্ধ বাতায়নগুলো খুলে দিয়ে বাহিরের বাতাস এবং পূর্ব্বপশ্চিমের দিবালোক ঘরের মধ্যে আনয়ন কর্‌তে পাব্‌ব। যে-সকল নির্জ্জীব সংস্কার আমাদের গৃহেব বায়ু দূষিত কর্‌চে কিম্বা গতিবিধির বাধারূপে পদে পদে স্থানাবরোধ করে' পড়ে' আছে, তাদের মধ্যে আমাদের চিন্তার বিদ্যুৎ-শিখা প্রবেশ করে' কতক-গুলিকে দগ্ধ এবং কতকগুলিকে পুনর্জ্জীবিত করে' দেবে। আমরা প্রধানত সৈনিক, বণিক অথবা পথিক-জাতি না হ'তেও পারি কিন্তু আমরা সুশিক্ষিত পরিণতবুদ্ধি সহৃদয় উদারস্বভাব মানবহিতৈষী ধর্ম্ম-পরায়ণ গৃহস্থ হয়ে উঠ্‌তে পারি এবং বিস্তর অর্থসামর্থ্য না থাক্‌লেও সদা-সচেষ্ট জ্ঞান প্রেমের দ্বারা সাধারণ মানবের যথেষ্ট সাহায্য করতেও পারি।

অনেকের কাছে এ "আইডিয়াল্"টা আশানুরূপ উচ্চ না মনে হ'তেও পারে কিন্তু আমার কাছে এটা বেশ সঙ্গত বোধ হয়। এমন কি, আমার মনে হয় পালোয়ান হওয়া আইডিয়াল নয়, সুস্থ হওয়াই আইডিয়াল্। অভ্রভেদী মন্যুমেন্ট্ কিম্বা পিরামিড্ আইডিয়াল্ নয়, বায়ু ও আলোকগম্য বাসযোগ্য সুদৃঢ় গৃহই আইডিয়াল।

একটা জ্যামিতির রেখা যতই দীর্ঘ এবং উন্নত করে' তোলা যায় তা'কে আকৃতির উচ্চ আদর্শ বলা যায় না। তেমনি মানবের বিচিত্র বৃত্তির সহিত সামঞ্জস্যরহিত একটা হঠাৎগগনস্পর্শী বিশেষত্বকে মনুষ্যত্বের আইডিয়াল্ বলা যায় না। আমাদের অন্তর এবং বাহিরের সম্যক্ স্ফূর্তি সাধন করে' আমাদের বিশেষ ক্ষমতাকে সুস্থ সুন্দর-ভাবে সাধারণ প্রকৃতির অঙ্গীভূত করে' দেওয়াই আমাদের যথার্থ সুপরিণতি।

আশা করি আমরা নানা ভ্রম এবং নানা আঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকেই যাচ্চি। এখনো আমরা দুই বিপরীত শক্তির মধ্যে দোদুল্যমান, তাই উভয় পক্ষের সত্যকেই অনিশ্চিত ছায়ার মত অস্পষ্ট দেখাচ্চে, কেবল মাঝে মাঝে ক্ষণেকের জন্য মধ্য আশ্রয়টি উপলব্ধি করে' ভবিষ্যতের পক্ষে একটা স্থির আশাভরসা জন্মে। আমার এই অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ রচনায় পর্য্যায়ক্রমে সেই আশা ও আশঙ্কার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

১২৯৮।

— —

অযোগ্য ভক্তি

ইষ্টি আর পুরোহিত
যাহা হ'তে সর্ব্বস্থিত
তারা যদি আসে বাড়ি পরে,
শুধু হাতে প্রণামেতে
ভার হ'য়ে যান তাতে
মুখে হাসি অন্তরে বেজার।
তিন টাকা নগদে দিলে
চরণ তুলি মাথা পরে
প্রসন্ন বদনে দেন বর।

উল্লিখিত শ্লোক তিনটি টাকা সম্বন্ধীয় একটি ছড়া হইতে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহার ছন্দ মিল এবং কবিত্ব সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই।

কেবল দেখিবার বিষয় এই যে, ইহার মধ্যে যে সত্যটুকু বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

টাকার যে কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা তাহারই অনেকগুলি দৃষ্টান্তের মধ্যে আমাদের অখ্যাতনামা কবি উপরের দৃষ্টান্তটিও নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু এ-দৃষ্টান্তে টাকার ক্ষমতা মানুষের মনের সেই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে যাহার প্রভাবে সে একই সময়ে একই লোককে যুগপৎ ভক্তি এবং অশ্রদ্ধা করিতে পারে।

সাধারণত গুরু পুরোহিত যে সাধুপুরুষ নহেন, সামান্য বৈষয়িকদের

মত পয়সার প্রতি তাঁহার যে বিলক্ষণ লোভ আছে সে-সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র অন্ধতা নাই, তথাপি তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়া থাকি কেননা গুরু ব্রহ্ম। এরূপ ভক্তি দ্বারা আমরা যে নিজেকে অপমানিত করি, এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে সম্মান করাই যে আত্মসম্মান এ-কথা আমরা মনেই করি না।

কিন্তু অন্ধ ভক্তি অন্ধ মানুষের মত অভ্যাসের পথ দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। সকল দেশেই ইহার নজির আছে। বিলাতে একজন লর্ডের ছেলে সর্ব্বতোভাবে অপদার্থ হইলেও অতি সহজেই যোগ্য লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে।

যাহাকে অনেকদিন অনেকে পূজা করিয়া আসিতেছে তাহাকে ভক্তি করিবার জন্য কোনো ভক্তিজনক গুণ বা ক্ষমতা বিচারের প্রয়োজন হয় না। এমন কি সে স্থলে অভক্তির প্রত্যক্ষ কারণ থাকিলেও অর্ঘ্য আপনি আসিয়া আবৃষ্ট হয়।

এইরূপ আমাদের মনের মধ্যে স্বভাবতই অনেকটা পরিমাণে জড়ধর্ম্ম আছে। সেই কারণে আমাদের মন অভ্যাসের গড়ান পথে মোহের আকর্ষণে আপনিই পাথরের মত গড়াইয়া পড়ে, যুক্তি তাহার মাঝখানে বাধা দিতে আসিলে যুক্তি চূর্ণ হইয়া যায়।

ভক্তির দ্বারা যে বিনতি আনয়ন করে সে বিনতি সকল ক্ষেত্রেই শোভন নহে। এই বিনতি, কেবল গ্রহণ করিবার, শিক্ষা করিবার, মাহাত্ম্যপ্রভাবের নিকট আপনার প্রকৃতিকে সাষ্টাঙ্গে অনুকূল করিবার জন্য। কিন্তু অমূলক বিনতি অস্থানে বিনতি সেই কারণেই দুর্গতি আনয়ন করে। তাহা হীনকে ভক্তি করিয়া হীনতা লাভ করে, তাহা অযোগ্যের নিকট নত হইয়া অযোগ্যতার জন্য আপনাকে অনুকূল করিয়া রাখে।

ভক্তি আমাদিগকে ভক্তিভাজনের আদর্শের প্রতি স্বতঃ আকর্ষণ

করে বলিয়াই সজীব সভ্যসমাজে কতকগুলি কঠিন বিচার প্রচলিত আছে। সেখানে যে লোকের এমন কোনো ক্ষমতা আছে যাহা সাধারণের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তাহাকে সমাজ সকল বিষয়েই নিষ্কলঙ্ক হইতে প্রত্যাশা করে। যে লোক রাজনীতিতে শ্রদ্ধেয় সে লোক ধর্ম্মনীতিতে হেয় হইলে সাধারণ দুর্নীতিপর লোক অপেক্ষা তাহাকে অনেক বেশি নিন্দনীয় হইতে হয়।

এই হিসাবে ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ অন্যায় আছে। কারণ, ক্ষমতা সর্ব্বতোব্যাপী হয় না, রাষ্ট্রনীতিতে যাহার বিচক্ষণতা তাহার ক্ষমতা এবং চরিত্রের অপর অংশ সাধারণ লোকের অপেক্ষা যে উন্নত হইবেই এমন কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম নাই—অতএব সাধারণ লোককে যে আদর্শে বিচার করি রাষ্ট্রনীতিতে বিচক্ষণ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রনীতি ব্যতীত অন্য অংশে সেই আদর্শে বিচার করাই উচিত। কিন্তু সমাজ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য এ-সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে অবিচার করিতে বাধ্য।

কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভক্তির দ্বারা মন গ্রহণ করিবার অনুকূল অবস্থায় উপনীত হয়। এক অংশ লইব এবং অপর অংশ লইব না এমন বিচারশক্তি তখন তাহার থাকে না।

কিন্তু যে বিষয়ে কোনো লোক অসাধারণ ঠিক সেই বিষয়েই সাধারণ লোকের পক্ষে তাহার অনুকরণ দুঃসাধ্য। সুতরাং যে অংশে সে সাধারণ লোকের অপেক্ষা উচ্চ নহে, এমন কি, যে অংশে তাহার দুর্ব্বলতা, সেই অংশেরই অনুকরণ দেখিতে দেখিতে ব্যাপ্ত এবং সফল হইয়া উঠে। এই জন্য যে লোক এক বিষয়ে মহৎ সে লোক অন্য বিষয়ে হীন হইলে সমাজ প্রথমত তাহার এক বিষয়ের মহত্ত্বও অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে,—তাহাতে যদি কৃতকার্য্য না হয় তবে তাহার হীনতার প্রতি সাধারণ হীনতা অপেক্ষা গাঢ়তর কলঙ্ক আরোপ করে। আত্মরক্ষার জন্য সভ্যসমাজের এইরূপ চেষ্টা। যে লোক অসাধারণ,

তাহাকে সংশোধন করিবার জন্য ততটা নহে, কিন্তু যাহারা সাধারণ লোক তাহাদিগকে ভক্তির কুফল হইতে রক্ষা করিবাব জন্য।

অহঙ্কারের কুফল সম্বন্ধে নীতিশাস্ত্রমাত্রেই আমাদিগকে সং করিয়া রাখে। অহঙ্কারে লোকেব পতন হয় কেন? প্রথম কারণ, নিজের বড়ত্ব সম্বন্ধে অতিবিশ্বাস থাকাতে সে পরকে ঠিকমত জানিতে পাবে না; যে সংসারে পাঁচজনের সহিত বাস করিতে ও কাজ করিতে হয় সেখানে নিজের তুলনায় অন্যকে যথার্থরূপে জানিতে পারিলে তবেই সকল বিষযে সফলতা লাভ করা সম্ভব। চীন দেশে আত্মাভিমানের প্রবলতায় জাপানকে চিনিতে পারে নাই। তাই তাহাব এমন অকস্মাৎ দুর্গতি ঘটিল। জর্ম্মানির সহিত যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। আব অতি দর্পে হতা লঙ্কা, একথা আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ। ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে, জ্ঞানই বল। কি গৃহে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে পরেব সম্বন্ধে ঠিকমত জ্ঞানই আমাদের প্রধান বল। অহঙ্কার সেই সম্বন্ধে অজ্ঞতা আনয়ন করিয়া আমাদেব দুর্ব্বলতার প্রধান কাবণ হইয়া থাকে।

অহঙ্কারের আর এক বিপদ, তাহা সংসারকে আমাদের প্রতিকূলে দাঁড় করায। যিনি যত বড লোকই হোন্ না কেন সংসারেব কাছে নানা বিষয়ে ঋণী; যে লোক সবিনয়ে সেই ঋণ স্বীকার করিতে না চাহে তাহার পক্ষে ঋণ পাওয়া কঠিন হয়।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ আর একটি আছে। বড়কে বড় বলিয়া জানায় একটি অধ্যাত্মিক আনন্দ আছে। আত্মার বিস্তার হয় বলিয়া সে আনন্দ। অহঙ্কার আমাদিগকে নিজের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া বাখে, যাহার ভক্তি নাই, সে জানে না অহঙ্কারের অধিকার কত সঙ্কীর্ণ; যাহার ভক্তি আছে সেই জানে আপনার বাহিরে যে বৃহত্ত্ব যে মহত্ত্ব তাহাই অনুভব করাতেই আত্মার মুক্তি।

এই জন্য বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক উভয় হিসারেই অহঙ্কারের এত নিন্দা।

কিন্তু অযথা ভক্তিও যে অহঙ্কারের মত সর্ব্বতোভাবে দূষ্য নীতি শাস্ত্রে সে কথার উল্লেখ থাকা উচিত। অন্ধ ভক্তিও পরের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার কারণ হয়। এবং অযোগ্য ভক্তিতে আমাদিগকে যদি আপনার সমকক্ষ অথবা আপনার অপেক্ষা হীনের নিকট নত করে তবে তাহাতে যে দীনতা উপস্থিত করে তাহা অহঙ্কারের সঙ্কীর্ণতা অপেক্ষা অল্প হেয় নহে এই জন্য ইংরাজ সমাজে অভিমানকে অহঙ্কারের মত নিন্দনীয় বলে না। অভিমান না থাকিলে মনুষ্য'ত্বর হানি হয় একথা তাহারা স্বীকার করে।

যাহার মনুষ্য'ত্বর অভিমান আছে সে কখনই অযোগ্য স্থানে আপনাকে নত করিতে পারে না। তাহার ভক্তির বৃত্তি যদি চরিতার্থতা চায় তবে সে যেখানে সেখানে লুটাইয়া পড়ে না,—সে যথোচিত সন্ধান ও প্রমাণের দ্বারা যথার্থ ভক্তিভাজনকে বাহির করে।

কিন্তু আমরা ভক্তিপ্রবণ জাতি। ভক্তি করাকেই আমরা ধর্ম্মাচরণ বলিয়া থাকি ;—কাহাকে ভক্তি করি তাহা বিচার করা আমাদের পক্ষে বাহুল্য।

আমাদের সৎপ্রবৃত্তিরও পথ যদি অত্যন্ত অবাধ হয় তাহাতে ভাল ফল হয় না। তাহার বল, তাহার সচেষ্টতা, তাহার আধ্যাত্মিক উজ্জ্বলতা রক্ষার জন্য, তাহাকে অমোঘ হইবার জন্য বাধার সহিত তাহার সংগ্রাম আবশ্যক।

যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ণয় করিতে হইলে তাহাকে পদে পদে সংশয়ের দ্বারা বাধা দিতে হয়, আপাতদৃষ্টিতে বিশ্ব সাধারণের কাছে যাহা অসন্দিগ্ধ সত্য বলিয়া খ্যাত তাহাকেও কঠিন প্রমাণের দ্বারা বারম্বার বিচিত্রভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। যে লোক অতি-

ব্যগ্রতাব সহিত তাড়াতাড়ি আপনার প্রশ্নেব উত্তর পাইতে চায় অধিকাংশ স্থলেই সে ভুল উত্তর পায়। যে-কোনো প্রকারে হোক্ জিজ্ঞাসাবৃত্তির নিবৃত্তিই মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে, সত্য নির্ণয়ই জিজ্ঞাসার প্রকৃত পবিণাম।

তেমনি, তাড়াতাড়ি কোনো প্রকারে ভক্তিবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনই ভক্তিব সার্থকতা নহে। বরঞ্চ কোনোমতে আপনাকে পরিতৃপ্ত করিবার অতিমাত্র আগ্রহে সে আপনাকে ভ্রান্ত পথে লইয়া যায়। এইরূপে সে মিথ্যা দেবতা, আত্মাবমান ও সহজ সাধনার সৃষ্টি করিতে থাকে। মহত্ত্বেব ধারণাই ভক্তির লক্ষ্য তা সে যতই কঠিন হোক্; আত্মপরিতৃপ্তি নহে, তা সে যতই সহজ ও সুখকর হোক্! জিজ্ঞাসা বৃত্তিব পথে বুদ্ধিবিচারই প্রধান আবশ্যক বাধা। সেই সঙ্গে একটা অভিমানও আছে। অভিমান বলে, আমাকে ফাঁকি দিতে পারিবে না। আমি এমন অপদার্থ নহি। যাহা তাহাকে আমি সত্য বলিয়া মানিতে পারি না। আগে আমার সমস্ত সংশয়কে পরাস্ত কর তবেই আমি সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ কবিতে পারি।

ভক্তিপথেও সেই বুদ্ধিবিচার ও অভিমানই অত্যাবশ্যক বাধা। সেই বাধা থাকিলে তবেই ভক্তি—যথার্থ ভক্তিভাজনকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। অভিমান সহজে মাথা নত হইতে দেয় না। যখন সে আত্মসমর্পণ করে তখন ভক্তিভাজনের পরীক্ষা হইয়া গেছে, রামচন্দ্র তখন ধনুক ভাঙিয়া তবে তাঁহার বলের প্রমাণ দিয়াছেন। সেই বাধা না থাকিলে ভক্তি অলস হইযা যায়, অন্ধ হইয়া যায়, কলের পুতুলের মত নির্ব্বিচারে ক্ষণে ক্ষণে মাথা নত করিয়া সে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। এইরূপে ভক্তি অধ্যাত্মশক্তি হইতে মোহে পরিণত হয়।

অনেক সময আমরা ভুল বুঝিয়া ভক্তি করি। যাহাকে মহৎ

মনে করি সে হয় ত মহৎ নয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কল্পনায় সে মহৎ ততক্ষণ তাহাকে ভক্তি করিলে ক্ষতির কারণ অল্পই আছে।

ক্ষতিব কারণ কিছু নাই তাহা নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহাকে মহৎ বলিয়া ভক্তি করি জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হই। যে লোক প্রকৃত মহৎ নহে কেবল আমাদের কল্পনায় ও বিশ্বাসে মহৎ, অন্ধভাবে তাহার আচরণের অনুকরণ আমাদের পক্ষে উন্নতিকর নহে।

কিন্তু আমাদের দেশে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা ভুল বুঝিয়াও ভক্তি করি। আমরা যাহাকে হীন বলিয়া জানি তাহাব পদধূলি অকৃত্রিম ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিতে ব্যগ্র হই।

আমাদের দেশে মোহান্তের মহৎ, পুবোহিতের পবিত্র এবং দেব-চরিত্রের উন্নত হওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ, আমরা ভক্তি লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছি। যে মোহান্ত জেলে যাইবার যোগ্য তাহার চরণামৃত পান করিয়া আমরা আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করি না, যে পুরোহিতেব চরিত্র বিশুদ্ধ নহে এবং যে লোক পূজানুষ্ঠানের মন্ত্রগুলির অর্থ পর্য্যন্তও জানে না তাহাকে ইষ্ট গুরুদেব বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের মুহূর্ত্তের জন্যও [illegible]া বোধ হয় না,—এবং আমাদেরই দেশে দেখা যায়, যে-সকল দেবতার পুরাণ-বর্ণিত আচরণ লক্ষ্য করিয়া আলাপে ও প্রচলিত কাব্যে ও গানে অনেক স্থলে নিন্দা ও পরিহাস করি সেই দেবতাকেই আমরা পূর্ণ ভক্তিতে পূজা করিয়া থাকি।

সুতরাং এস্থলে সহজেই মনে প্রশ্ন উঠে, কেন পূজা করি? তাহার এক উত্তর এই যে, অভ্যাসবশত অর্থাৎ মনের জড়ত্ব বশত, দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ভক্তিজনক গুণের জন্য নহে পরন্তু শক্তি কল্পনা করিয়া এবং সেই শক্তি হইতে ফল কামনা করিয়া।

আমাদের উদ্ধৃত শ্লোকের প্রথমেই আছে "ইষ্ট আর পুরোহিত

যাহা হ'তে সর্ব্বস্থিত।” ইহাতেই বুঝা যাইতেছে গুরু ও পুরোহিতের মধ্যে আমরা একটা গূঢ় শক্তি কল্পনা করিয়া থাকি, তাঁহাদের শিক্ষা, চরিত্র ও আচরণ যেমনই হৌক্ তাঁহারা আমাদের সাংসারিক মঙ্গলের প্রধান কারণ এবং তাঁহাদের প্রতি ভক্তিতে লাভ ও অভক্তিতে লোকসান আছে এই বিশ্বাস আমাদের মাথাকে তাঁহাদের পায়ের কাছে নত করিয়া রাখিয়াছে। কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিশ্বাস এতদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে যে তাঁহারা গৃহধর্ম্মনীতির সুস্পষ্ট ব্যভিচার দ্বারাও গুরুভক্তিকে অন্যায় প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

দেবতা সম্বন্ধেও সে-কথা খাটে। দেবচরিত্র আমাদের আদর্শ চরিত্র হইবে এমন আবশ্যক নাই। দেবভক্তিতে ফল আছে, কারণ দেবতা শক্তিমান।

ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও তাহাই। ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র নরাধম হইলেও ব্রাহ্মণ বলিয়াই পূজ্য। ব্রাহ্মণের কতকগুলি নিগূঢ় শক্তি আছে। তাঁহাদের প্রসাদে ও বিরাগে আমাদের ভালমন্দ ঘটিয়া থাকে। এরূপ ভক্তিতে ভক্ত ও ভক্তিপাত্রের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ থাকে না, দেনা-পাওনার সম্বন্ধই দাঁড়াইয়া যায়। সেই সম্বন্ধে ভক্তিপাত্রকেও উচ্চ হইতে হয় না এবং ভক্তও নীচতা লাভ করে।

কিন্তু আমাদের দেশের দেবভক্তি সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত অনেকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম তর্ক করেন। তাঁহারা বলেন ঈশ্বর যখন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী তখন ঈশ্বর বলিয়া আমরা যাঁহাকেই পূজা করি ঈশ্বরই সে-পূজা গ্রহণ করেন। অতএব এরূপ ভক্তি নিষ্ফল নহে।

পূজা যেন খাজনা দেওয়ার মত, স্বয়ং রাজার হস্তেই দিই আর তাঁহার তহশিলদারের হস্তেই দিই একই রাজভাণ্ডারে গিয়া জমা হয়।

দেবতার সহিত দেনা-পাওনার সম্বন্ধ আমাদের মনে এমনই বদ্ধমূল হইয়া গেছে যে, পূজার দ্বারা ঈশ্বরের যেন একটা বিশেষ উপকার

করিলাম এবং তাহার পরিবর্ত্তে একটা প্রত্যুপকার আমার পাওনা রহিল ইহাই ভুলিতে না পারিয়া আমরা দেবভক্তি সম্বন্ধে এমন দোকানদারীর কথা বলিয়া থাকি। পূজাটা দেবতার হস্তগত হওয়াই যখন বিষয়, এবং সেটা ঠিকমত তাঁহার ঠিকানায় পৌছিলেই যখন আমার কিঞ্চিৎ লাভ আছে, তখন যত অল্প ব্যয়ে অল্প চেষ্টায় সেটা চালান্ করা যায় ধর্ম্ম ব্যবসায়ে ততই আমার জিৎ। দরকার কি ঈশ্বরের স্বরূপ ধারণা চেষ্টায়, দরকার কি কঠোর সত্যানুসন্ধানে; সম্মুখে কাষ্ঠ, প্রস্তর, যাহা উপস্থিত থাকে তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা নিবেদন করিয়া দিলে যাঁহার পূজা তিনি আপনি ব্যগ্র হইয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া লইবেন।

আমাদের পুরাণে ও প্রচলিত কাব্যে যেরূপ বর্ণনা আছে তাহাতে মনে হয় দেবতারা যেন আপনাদের পূজা গ্রহণের জন্য মৃতদেহের উপর শকুনী গৃধিনীর ন্যায় কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছেন। অতএব আমাদের নিকট হইতে ভক্তিগ্রহণের লোলুপতা যে ঈশ্বরেরই একথা আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনেও অলক্ষ্যে বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু, কি মনুষ্যপূজায় এবং কি দেবপূজায়, ভক্তি ভক্তেরই লাভ। যাঁহাকে ভক্তি করি তিনি না জানিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু তাঁহাকেই আমার জানা চাই, তবেই আমার ভক্তির সার্থকতা। পূজ্য ব্যক্তির আদর্শকে আমাদের প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণ মিশাইয়া লইতে চাহিলে ভক্তি ছাড়া আর কোনো উপায়ই নাই। আমরা যাঁহাকে পূজা করি তাঁহাকেই যদি বস্তুত চাই তবে তাঁহার প্রকৃতির আদর্শ তাঁহার সত্যস্বরূপ একান্ত ভক্তিযোগে হৃদয়ে স্থাপনা করিতে হয়। সেরূপ অবস্থায় ফাঁকি দিতে স্বতই প্রবৃত্তি হয় না,—তাঁহার সহিত বৈসাদৃশ্য ও দূরত্ব যতই দীনত্বের সহিত অনুভব করি ততই ভক্তি বাড়িয়া উঠিয়া ক্ষুদ্র আপনাকে তাঁহার সহিত লীন করিবার চেষ্টা করে।

ইহাই ভক্তির গৌরব। ভক্তিরস সেই আধ্যাত্মিক রসায়নশক্তি যাহা ক্ষুদ্রকে বিগলিত করিয়া মহতের সহিত মিশ্রিত করিতে পারে।

অতএব ঈশ্বরকে যখন ভক্তি করি তখন তদ্দ্বারা তাঁহার ঐশ্বর্য্য বাড়ে না—আমরাই সেই রসস্বরূপের রাসায়নিক মিলন লাভ করি। আমাদের ঈশ্বরের আদর্শ যত মহৎ মিলনের আনন্দ ততই প্রগাঢ়, এবং তদ্দ্বারা আত্মার প্রসারতা ততই বিপুল হইবে।

ভক্তি আমরা যাঁহাকে করি তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পাই না। যদি গুরুকে ব্রহ্ম বলিয়া ভক্তি করি তবে সেই গুরুর আদর্শই আমাদের মনে অঙ্কিত হয়। ভক্তিব প্রবলতার দ্বারা সেই গুরুর মানস আদর্শ তাঁহার স্বাভাবিক আদর্শ অপেক্ষা কতকটা পরিমাণে আপনি বাড়িয়া যায় সন্দেহ নাই কিন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না।

অস্থানে ভক্তি করিবার একটা মহৎ পাপ এই যে, যিনি যথার্থ পূজ্য, অযোগ্য পাত্রদের সহিত তাঁহাকে একাসনভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। দেবতায় উপদেবতায় প্রভেদ থাকে না।

আমাদের দেশে এই অন্যায় মিশ্রণ সকল দিকেই ঘটিয়াছে। আমাদের দেশে অনাচার, আচারের ত্রুটি এবং ধর্ম্মনিয়মের লঙ্ঘনকে একত্র মিশ্রিত করিয়া আমরা ঘোরতর জড়বাদ ও নিগূঢ় নাস্তিকতায় উপনীত হইয়াছি।

ভক্তিরাজ্যেও সেইরূপ মিশ্রণ ঘটাইয়া আমরা ভক্তির অধ্যাত্মিকতা নষ্ট করিয়াছি। সেই জন্যই আমরা বরঞ্চ সাধু শূদ্রকে ভক্তি করি না কিন্তু অসাধু ব্রাহ্মণকে ভক্তি করি। আমরা প্রভাতসূর্য্যালোকিত হিমাদ্রিশিখরের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া চলিয়া যাইতে পারি কিন্তু সিন্দুরলিপ্ত উপলখণ্ডকে উপেক্ষা করিতে পারি না।

সত্য এবং শাস্ত্রের মধ্যেও আমরা এইরূপ একটা জটা পাকাইয়াছি। সমুদ্রযাত্রা উচিত কি না তাহা নির্ণয় করিতে ইহাই দেখা কর্ত্তব্য যে,

নূতন দেশ ও নূতন আচার-ব্যবহার দেখিয়া আমাদের জ্ঞানের বিস্তার হয় কি না, আমাদের সঙ্কীর্ণতা দূর হয় কি না, ভূখণ্ডের একটি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কোনো জ্ঞানপিপাসু উন্নতি-ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক বদ্ধ করিয়া রাখিবার ন্যায্য অধিকার কাহারও আছে কি না। কিন্তু তাহা না দেখিয়া আমরা দেখিব পরাশর সমুদ্র পার হইতে বলিয়াছেন কি না এবং অত্রি কি বলিয়া তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

এমন বিপরীত-বিকৃতি কেন ঘটিল? ইহার প্রধান কারণ এই যে, স্বাধীনতাতেই যে-সমস্ত প্রবৃত্তির প্রধান গৌরব তাহাদিগকেই বন্ধনে বদ্ধ করা হইয়াছে।

অভ্যাস বা পরের নির্দ্দেশবশত নহে পরন্তু স্বাধীন বোধশক্তিযোগে যে-ভক্তিবলে আমরা মহত্ত্বের নিকট আত্মসমর্পণ করি তাহাই সার্থক ভক্তি।

কিন্তু আশঙ্কা এই যে, যদি বোধশক্তি তোমার না থাকে! অতএব নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া গেল অমুক সম্প্রদায়কে এই প্রণালীতে ভক্তি করিতেই হইবে। না করিলে সাংসারিক ক্ষতি ও পুরুষানুক্রমে নরকবাস।

গাছ মাটিতে রোপণ করিলে তাহাকে গরুতে খাইতে পারে, তাহাকে পথিকে দলন করিতে পারে, এই ভয়ে তাহাকে লোহার সিন্ধুকে বদ্ধ রাখা হইল। সেখানে সে নিরাপদে রহিল কিন্তু তাহাতে ফল ধরিল না; সজীব গাছ মৃত কাষ্ঠ হইয়া গেল।

মানুষের বুদ্ধিকে যতক্ষণ স্বাধীনতা না দেওয়া যায় ততক্ষণ সে ব্যর্থ। কিন্তু যদি সে ভুল করে, অতএব তাহাকে বাঁধ; আমি বুদ্ধিমান যে ঘানিগাছ রোপন করিলাম চোখে ঠুলি দিয়া সেইটেকে সে নিত্যকাল প্রদক্ষিণ করিতে থাক্।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাকে কোনো দিন মাথা ঘুরাইতে হইবে না—

আমি ঠিক কবিয়া দিলাম কোন তিথিতে মূলা খাইলে তাহাব নবক এবং চিঁডা খাইলে তাহাব অক্ষয় ফল। তোমাব মূলা ছাডিয়া চিঁডা খাইয়া তাহাব কি উপকাব হইল তাহাব কোনো প্রমাণ নাই কিন্তু যাহা অপকাব হইল ইতিহাসে তাহা উত্তবোত্তব পুঞ্জীকৃত হইযা

১৩০৫।

চিঠিপত্র

(১)

চিবঞ্জীবেষু—

ভায়া নবীনকিশোব, এখনকাব আদবকায়দা আমাব ভাল জানা নাই —সেই জন্য তোমাদেব সঙ্গে প্রথম আলাপ, বা চিঠিপত্র আবম্ভ কবিতে কেমন ভয় কবে। আমবা প্রথম আলাপে বাপেব নাম জিজ্ঞাসা কবিতাম কিন্তু শুনিয়াছি এখনকার কালে বাপেব নাম জিজ্ঞাসা দস্তুব নয়। সৌভাগ্যক্রমে তোমাব বাবাব নাম আমাব অবিদিত নাই, কাবণ আমিই তাঁহাব নামকবণ কবিয়াছিলাম। ভাল নাম দিতে পাবি নাই—গোবর্দ্ধন নামটা কেন দিয়াছিলাম তাহা আজ বুঝিতেছি। তোমাকে বর্দ্ধন করিবাব ভাব তাঁহাব উপবে পডিবে ভাগ্য-দেবতা তাহা জানিতেন। সেই জন্যই বোধ কবি সেদিন ন্যায়বত্ন মহাশয় তোমাকে তোমাব ঠাকুরেব নাম জিজ্ঞাসা করাতে তোমাব মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তা তুমিই না হয় তোমার বাবাব নূতন নামকবণ কব আমাব গোবর্দ্ধন নাম আমি ফিরাইয়া লইতেছি।

আসল কথা কি জান? সেকালে আমরা নাম লইয়া এত ভাবিতাম না। সেটা হয়ত আমাদের অসভ্যতার পরিচয়। আমরা মনে করিতাম, নামে মানুষকে বড় করে না, মানুষই নামকে জাঁকাইয়া তোলে। মন্দ কাজ করিলেই মানুষের বদ্‌নাম হয়, ভাল কাজ করিলেই মানুষের সুনাম হয়। বাবা কেবল একটা নামই দিতে পারে কিন্তু ভাল নাম কিম্বা মন্দ নাম সে ছেলে নিজেই দেয়। ভাবিয়া দেখ আমাদের প্রাচীনকালের বড় বড় নাম শুনিতে নিতান্ত মধুর নয়— যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, জন্মেজয়, বৈশম্পায়ন ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সকল নাম অক্ষয়-বটের মত আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের হৃদয়ে সহস্র শিকড়ে বিরাজ করিতেছে। আমাদের আজকালকার উপন্যাসের ললিত, নলিনমোহন, প্রভৃতি কত মিঠি মিঠি নাম বাহির হইতেছে কিন্তু এখনকার পাঠক-পিপীলিকারা এই মিষ্ট নামগুলিকে দুই দণ্ডেই নিঃশেষ করিয়া ফেলে, সকালের নাম বিকালে টিকে না। যাহাই হউক, আমরা নামের প্রতি মনোযোগ করিতাম না। তুমি বলিতেছ, সেটা আমাদের ভ্রম। সে-জন্য বেশী ভাবিও না ভাই; আমরা শীঘ্রই মরিব এমন সম্ভাবনা আছে; আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসমাজের সমস্ত ভ্রম সমূলে সংশোধিত হইয়া যাইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখনকার আদবকায়দা আমার বড় জানা নাই, কিন্তু ইহাই দেখিতেছি আদবকায়দা এখনকার দিনে নাই, আমাদের কালেই ছিল। এখন বাপকে প্রণাম করিতে লজ্জাবোধ হয়, বন্ধুবান্ধবকে কোলাকোলি করিতে সঙ্কোচবোধ হয়, গুরুজনের সম্মুখে তাকিয়া ঠেসান দিয়া তাস পিটিতে লজ্জাবোধ হয় না, রেলগাড়িতে যে বেঞ্চে পাঁচজনে বসিয়া আছে তাহার উপরে দুইখানা পা তুলিয়া দিতে সঙ্কোচ জন্মে না। তবে হয় ত আজকাল অত্যন্ত সহৃদয়তার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আদবকায়দার তেমন আবশ্যক নাই। সহৃদয়তা! তাই

বুঝি কেহ পাড়া প্রতিবেশীর খোঁজ রাখে না! বিপদ আপদে লোকের সাহায্য করে না; হাতে টাকা থাকিলে সামান্য জাঁকজমক লইয়াই থাকে, দশজন অনাথকে প্রতিপালন করে না; তাই বুঝি পিতা মাতা অযত্নে অনাদরে কষ্টে থাকেন অথচ নিজের ঘরে সুখ স্বচ্ছন্দতার অভাব নাই—নিজের সামান্য অভাবটুকু হইলেই রক্ষা নাই—কিন্তু পরিবারস্থ আর সকলের ঘরে গুরুতর অনটন হইলেও বলেন হাতে টাকা নাই। এই ত ভাই এখনকার সহৃদয়তা! মনের দুঃখে অনেক কথা বলিলাম। আমি কালেজে পড়ি নাই সুতরাং আমার এত কথা বলিবার কোনো অধিকার নাই। কিন্তু তোমরা কিছু আমাদের নিন্দা করিতে ছাড় না, আমরাও যখন তোমাদের সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলি সে কথাগুলোয় একটু কর্ণপাত করিয়ো।

চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিয়াই তোমাকে কি "পাঠ" লিখিব এই ভাবনা প্রথম মনে উদয় হয়। একবার ভাবিলাম লিখি "মাই ডিয়ার নাতি," কিন্তু সেটা আমার সহ্য হইল না; তার পরে ভাবিলাম বাঙ্গালা করিয়া লিখি "আমার প্রিয় নাতি," সেটাও বুড় মানুষের এই খাক্‌ড়ার কলম দিয়া বাহির হইল না। খপ্‌ করিয়া লিখিয়া ফেলিলাম "পরম শুভাশীর্ব্বাদ রাশয়ঃ সন্তু।" লিখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ভাবিলাম ছেলেপিলেরা ত আমাদিগকে প্রণাম করা বন্ধ করিয়াছে তাই বলিয়া কি আমরা তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিব! তোমাদের ভাল হউক ভাই, আমরা এই চাই; আমাদের যা হইবার হইয়া গিয়াছে। তোমরা আমাদের প্রণাম কর আর না কর আমাদের তাহাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু তোমাদের আছে। ভক্তি করিতে যাহাদের লজ্জাবোধ হয় তাহাদের কোনো কালে মঙ্গল হয় না। বড়র কাছে নীচু হইয়া আমরা বড় হইতে শিখি, মাথাটা তুলিয়া থাকিলেই যে বড় হই তাহা নয়। পৃথিবীতে আমার চেয়ে উঁচু আর কিছু নাই, আমি বাবার জ্যেষ্ঠতাত,

আমি দাদার দাদা এইটে যে মনে করে সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাহার হৃদয় এত ক্ষুদ্র যে সে আপনার চেয়ে বড় কিছুই কল্পনা করিতে পারে না। তুমি হয়ত আমাকে বলিবে, তুমি আমার দাদা মহাশয় বলিয়াই যে তুমি আমার চেয়ে বড় এমন কোনো কথা নাই। আমি তোমার চেয়ে বড় নই! তোমার পিতা আমার স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছেন, আমি তোমার চেয়ে বড় নইত কি! আমি তোমাকে স্নেহ করিতে পারি বলিয়া আমি তোমার চেয়ে বড়, হৃদয়ের সহিত তোমার কল্যাণ কামনা করিতে পারি বলিয়াই আমি তোমার চেয়ে বড়। তুমি না হয় দু'-পাঁচখান ইংরাজী বই আমার চেয়ে বেশী পড়িয়াছ, তাহাতে বেশী আসে যায় না। আঠার হাজার ওয়েবষ্টার ডিকস্‌নারির উপর যদি তুমি চড়িয়া বস তাহা হইলেও তোমাকে আমার হৃদয়ের নীচে দাঁড়াইতে হইবে। তবুও আমার হৃদয় হইতে আশীর্ব্বাদ নামিয়া তোমার মাথায় বর্ষিত হইতে থাকিবে। পুঁথির পর্ব্বতের উপর চড়িয়া তুমি আমাকে নীচু নজরে দেখিতে পার, তোমার চক্ষের অসম্পূর্ণতা বশত আমাকে ক্ষুদ্র দেখিতে পার, কিন্তু আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে পার না। যে ব্যক্তি মাথা পাতিয়া অসঙ্কোচে স্নেহের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে পারে সে ধন্য, তাহার হৃদয় উর্ব্বর হইয়া ফলে ফুলে শোভিত হইয়া উঠুক। আর যে ব্যক্তি বালুকা-স্তূপের মত মাথা উঁচু করিয়া স্নেহের আশীর্ব্বাদ উপেক্ষা করে সে তাহার শূন্যতা, শুষ্কতা, শ্রীহীনতা, তাহার মরুময় উন্নত মস্তক লইয়া মধ্যাহ্ন-তেজে দগ্ধ হইতে থাকুক। যাহাই হউক ভাই আমি তোমাকে একশ বার লিখিব, "পরম শুভাশীর্ব্বাদ রাশয়ঃ সন্তু" তুমি আমার চিঠি পড় আর নাই পড়।

তুমিও যখন আমার চিঠির উত্তর দিবে প্রণামপূর্ব্বক চিঠি আরম্ভ করিয়ো। তুমি হয়ত বলিয়া উঠিবে "আমার যদি ভক্তি না হয় ত আমি কেন প্রণাম করিব।" এসব অসভ্য আদবকায়দার আমি কোনো

ধার ধারিনা। তাই যদি সত্য হয় তবে কেন ভাই তুমি বিশ্বসুদ্ধ লোককে "মাই ডিয়ার" লেখ। আমি বুড়, তোমার ঠাকুরদাদা, আজ সাড়ে তিন মাস ধরিয়া কাশিয়া মরিতেছি তুমি একবার খোঁজ লইতে আস না। আর জগতের সমস্ত লোক তোমার এমনি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাদিগকে মাই ডিয়ার না লিখিয়া থাকিতে পার না। এও কি একটা দস্তুর মাত্র নয়! কোন্‌টা বা ইংরাজী দস্তুর কোন্‌টা বাংলা দস্তুর। কিন্তু সেই যদি দস্তুর মতই চলিতে হইল তবে বাঙালীর পক্ষে বাংলা দস্তুরই ভাল। তুমি বলিতে পার "বাঙালাই কি ইংরাজিই কি কোনো দস্তুর, কোনো আদবকায়দা মানিতে চাহি না। আমি হৃদয়ের অনুসরণ করিয়া চলিব।" তাই যদি তোমার মত হয় তুমি সুন্দরবনে গিয়া বাস কর, মনুষ্যসমাজে থাকা তোমার কর্ম্ম নয়। সকল মানুষেরই কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, সেই কর্ত্তব্য-শৃঙ্খলে সমাজ জড়িত। আমার কর্ত্তব্য আমি না করিলে তোমার কর্ত্তব্য তুমি ভালরূপে করিতে পার না। দাদামহাশয়ের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, নাতির কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে। তুমি যদি আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমার আদেশ পালন কর, তবেই তোমার প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমি ভালরূপে সম্পন্ন করিতে পারি। আর, তুমি যদি বল আমার মনে ভক্তির উদয় হইতেছে না তখন আমি কেন দাদামহাশয়ের কথা শুনিব, তাহা হইলে যে কেবল তোমার কর্ত্তব্যই অসম্পূর্ণ রহিল তাহা নহে তাহা হইলে আমার কর্ত্তব্যেরও ব্যাঘাত হয়। তোমার দৃষ্টান্তে তোমার ছোট ভাইরাও আমার কথা মানিবে না, দাদামহাশয়ের কাজ আমার দ্বারা একেবারেই সম্পন্ন হইতে পারিবে না। এই কর্ত্তব্যপাশে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য অবিশ্রাম স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, সমাজে অনেকগুলি দস্তুর প্রচলিত আছে। সৈন্যদের যেমন অসংখ্য নিয়মে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় নহিলে তাহারা

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না, সকল মানুষকেই তেমনি সহস্র দস্তুরে বদ্ধ থাকিতে হয়, নতুবা তাহারা সমাজের কার্য্য পালনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না। যে গুরুজনকে তুমি প্রণাম করিয়া থাক, যাঁহাকে প্রত্যেক চিঠিপত্রে তুমি ভক্তির সম্ভাষণ কর, যাঁহাকে দেখিলে তুমি উঠিয়া দাঁড়াও, ইচ্ছা করিলেও সহসা তাঁহাকে তুমি অমান্য করিতে পার না। সহস্র দস্তুর পালন করিয়া এম্‌নি তোমার মনে শিক্ষা হইয়া যায় যে গুরুজনকে মান্য করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠে, না করা তোমার পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। আমাদের প্রাচীন দস্তুর সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আমরা এই সকল শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। ভক্তি-স্নেহের বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইতেছে। পারিবারিক সম্বন্ধ উল্টাপাল্টা হইয়া যাইতেছে। সমাজে বিশৃঙ্খলা জন্মিয়াছে। তুমি দাদামহাশয়কে প্রণাম করিয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ কর না সেটা শুনিতে অতি সামান্য বোধ হইতে পারে কিন্তু নিতান্ত সামান্য নহে। কতকগুলি দস্তুর আমাদের হৃদয়ের সহিত জড়িত, তাহার কতটুকু দস্তুর বা কতটুকু হৃদয়ের কার্য্য বলা যায় না। অকৃত্রিম ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমরা প্রণাম করি কেন? প্রণাম করাও ত একটা দস্তুর। এমন দেশ আছে যেখানে ভক্তিভাবে প্রণাম না করিয়া আর কিছু করে। আমরা প্রণাম না করিয়া তা করিনা কেন! প্রণামের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে ভক্তির বাহ্যলক্ষণস্বরূপ এক প্রকার অঙ্গভঙ্গী আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহাকে আমরা ভক্তি করি তাঁহাকে স্বভাবতই আমাদের হৃদয়ের ভক্তি দেখাইতে ইচ্ছা হয়, প্রণাম করা সেই ভক্তি দেখাইবার উপায় মাত্র। আমি যদি প্রণাম না করিয়া ভক্তিভরে তিনবার হাততালি দিই তাহা হইলে যাঁহাকে ভক্তি করিলাম তিনি কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। এমন কি তাহা অপমান জ্ঞান করিতে পারেন। ভক্তি দেখাইবার সময়ে হাততালি দেওয়াই যদি দস্তুর থাকিত তাহা হইলে

প্রণাম করা অত্যন্ত দোষের হইত সন্দেহ নাই। অতএব দস্তুরকে পরিত্যাগ করিয়া আমবা হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে পারি না, হৃদয়ের অভাব প্রকাশ করি বটে।

অতএব আমাকে প্রণাম-পুবঃসর চিঠি লিখিবে। ভক্তি থাক্—আর নাই থাক্—সে দেখিতে বড় ভাল হয়। তোমার দেখাদেখি আর পাঁচজনে দাদামহাশয়কে ভদ্র রকমে চিঠি লিখিতে শিখিবে এবং ক্রমে ভক্তি করিতেও শিখিবে।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্ম্মণঃ।

(২)

শ্রীচরণকমলযুগলেষু। আরও ভক্তি চাই, যুগলের উপর আরও এক যোজা বাড়াইযা দিব! দাদামহাশয় তোমাব অন্ত পাওয়া ভার, চিরকাল তুমি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করিয়া আসিয়াছ, আর আজ হঠাৎ ভক্তি আদায় করিবার জন্য আমাদের উপর এক পরোয়ানা-পত্র বাহির করিয়াছ, ইহার অর্থ কি! আমি দেখিয়াছি, যে-অবধি তোমার সুমুখের এক যোড়া দাঁত পড়িয়া গিয়াছে সেই অবধি তোমার মুখে কিছুই বাধে না। তোমার দাঁত গিয়াছে বটে কিন্তু তীব্র ধারটুকু তোমার জিভের আগায় রহিয়া গিয়াছে। আর আগেকার মত পরমানন্দে রুই মাছের মুড়ো চিবাইতে পার না, সুতরাং দংশন করিবার সুখ তোমার নিরীহ নাতিদের কাছ হইতে আদায় কর। তোমার

দন্তহীন হাসিটুকু আমার বড় মিষ্ট লাগে। কিন্তু তোমার দন্তহীন দংশন আমার তেমন উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় না।

তোমাদের কালের সবই ভাল, আমাদের কালে সবই মন্দ, এইটি তুমি প্রমাণ করিতে চাও। দু'-একটা কথা বলিবার আছে; তাহাতে যদি তোমাদের আদবকায়দার কোনো ব্যতিক্রম হয় তবে আমাকে মাপ করিতে হইবে। আমরা যাহা করি তাহা তোমাদের চক্ষে বেয়াদবী বলিয়া ঠেকে, এই জন্যই ভয় হয়। তোমরা চোখে কম দেখ কিন্তু নাতিদের একটি সামান্য ত্রুটি চষমা না লইয়াও বেশ দেখিতে পাও।

যে লোক যে-কালে জন্মগ্রহণ করে সে-কালের প্রতি তাহার যদি হৃদয়ের অনুরাগ না থাকে তবে সে-কালের উপযোগী কাজ সে ভাল করিয়া করিতে পারে না। যদি সে মনে করে, যে-কাল গেছে তাহাই ভাল, আর আমাদের কাল অতি হেয়, তবে তাহার কাজ করিবার বল চলিয়া যায়, ভূত কালের দিকে শিয়র করিয়া সে কেবল স্বপ্ন দেখে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবং ভূত-ত্ব প্রাপ্ত হওয়াই সে একমাত্র বাঞ্ছনীয় মনে করে। স্ব-দেশ যেমন একটা আছে, স্ব-কালও তেমনি একটা আছে। স্বদেশকে ভাল না বাসিলে যেমন স্বদেশের কাজ করা যায় না, তেমনি স্ব-কালকেও ভাল না বাসিলে স্ব-কালের কাজও করা যায় না। যদি ক্রমাগতই স্বদেশের নিন্দা করিতে থাক, স্বদেশের কোনো গুণই দেখিতে না পাও, তবে স্বদেশের উপযোগী কাজ তোমার দ্বারা ভালরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। কেবলমাত্র কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তুমি স্বদেশের উপকার করিতে চেষ্টা করিতে পার, কিন্তু সে-চেষ্টা সফল হয় না। তোমার হৃদয়হীন কাজগুলো বিদেশী বীজের মত স্বদেশের জমিতে ভাল করিয়া অঙ্কুরিত হইতে পারে না। তেমনি স্ব-কালের যে কেবল দোষই দেখে কোনো গুণ দেখিতে পায় না, সে চেষ্টা করিলেও স্ব-কালের কাজ ভাল করিয়া করিতে পারে না। এক হিসাবে সে নাই বলিলেও হয়;

সে জন্মায় নাই; সে অতীতকালে জন্মিয়াছে, সে অতীতকালে বাস করিতেছে; একালের জন-সংখ্যার মধ্যে তাহাকে ধরা যায় না। ঠাকুরদাদা মশায়, তুমি যে তোমাদের কালকে ভালবাস এবং ভাল বল, সে তোমার একটা গুণের মধ্যে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে তোমাদের কালের কর্ত্তব্য তুমি করিয়াছ। তুমি তোমার বাপ মাকে ভক্তি করিয়াছ, তোমার পাড়াপ্রতিবেশীদের বিপদে আপদে সাহায্য করিয়াছ, শাস্ত্র-মতে ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়াছ, দান ধ্যান করিয়াছ, হৃদয়ের পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছ। যে-দিন আমরা আমাদের কর্ত্তব্যকাজ করি, সে-দিনের সূর্য্যালোক আমাদের কাছে উজ্জ্বলতর বলিয়া বোধ হয়, সে-দিনের সুখস্মৃতি বহুকাল ধরিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সে-কালের কাজ তোমরা শেষ করিয়াছ অসম্পূর্ণ রাখ নাই, সেই জন্য আজ এই বৃদ্ধ বয়সে, অবসরের দিনে সে-কালের স্মৃতি এমন মধুর বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া একালের প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছ কেন? ক্রমাগতই একালের নিন্দা করিয়া একালের কাছ হইতে আমাদের হৃদয় কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছ কেন? আমাদিগের জন্মভূমি এবং আমাদের জন্মকাল এই দু'য়ের উপরেই আমাদের অনুরাগ অটল থাকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

গঙ্গোত্রীর সহিত গঙ্গার অবিচ্ছিন্ন সহস্রধারে যোগ রক্ষা হইতেছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া গঙ্গা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পিছু হটিয়া গঙ্গোত্রীর উপরে আর উঠিতে পারে না। তেমনি তোমাদের কাল ভালই হউক্ আর মন্দই হউক্ আমরা কোনোমতেই ঠিক সে-জায়গায় যাইতে পারিব না। এটা যদি নিশ্চয় হয় তবে সাধ্যাতীতের জন্য নিষ্ফল বিলাপ ও পরিতাপ না করিয়া যে অবস্থায় জন্মিয়াছি তাহারই সহিত বনিবনাও করিয়া লওয়াই ভাল,—ইহার ব্যাঘাত যে করে সে অনেক অমঙ্গল সৃষ্টি করে।

বর্ত্তমানের প্রতি অরুচি ইহা প্রায়ই বর্ত্তমানের দোষে হয় না, আমাদের নিজের অসম্পূর্ণতা বশত হয়, আমাদের হৃদয়ের গঠনের দোষে হয়। বর্ত্তমানই আমাদের বাসস্থান এবং কার্য্যক্ষেত্র। কার্য্যক্ষেত্রের প্রতি যাহাব অনুরাগ নাই সে ফাঁকি দিতে চায়। যথার্থ কৃষক আপনার চাষের জমিটুকুকে প্রাণের মত ভালবাসে, সেই জমিতে সে শস্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম বপন করে ; আর যে কৃষক কাজ করিতে চায় না ফাঁকি দিতে চায়, নিজের জমিতে পা দিলে তাহার পায় যেন কাঁটা ফুটিতে থাকে, সে কেবলই খুঁৎ খুঁৎ করিয়া বলে আমার জমির এ দোষ সে দোষ, আমার জমিতে, কাঁকর, আমার জমিতে কাঁটাগাছ ইত্যাদি। নিজের ছাড়া আর সকলের জমি দেখিলেই তাহার চোখ জুড়াইয়া যায়।

সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং হইয়াই থাকে। সেই পরিবর্ত্তনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। নহিলে, আমাদের জীবনই নিস্ফল। নহিলে, মিউজিয়মে প্রাচীনকালের জীবেরা যেমন করিয়া স্থিতি করিতেছে আমাদিগকেও ঠিক তেমনি করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হইবে। পরিবর্ত্তনের মধ্যে যেটুকু সার্থকতা আছে, যেটুকু গুণ আছে তাহা আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কারণ সেইখান হইতে রসাকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে বাড়িতে হইবে, আর কোনো গতি নাই। যদি আমরা সত্যই জলে পড়িয়া থাকি তবে সেখানে ডাঙ্গার মত চলিতে চেষ্টা করা বৃথা, সাঁতার দিতে হইবে।

অতএব, তুমি যে বলিতেছ, আমরা আজ-কাল গুরুজনকে যথেষ্ট মান্য করি না সেটা মানিয়া লওয়া যাক্, তার পরে এই পরিবর্ত্তনের ভিতরকার কথাটা একবার দেখিতে চেষ্টা করা যাক্। এ-কথাটা ঠিক নহে যে ভক্তিটা সময়ের প্রভাবে মানুষের হৃদয় হইতে একেবারে চলিয়া গেছে—তবে কি না, ভক্তিস্রোতের মুখ একদিক হইতে অন্য দিকে গেছে একথা সম্ভব হইতে পারে বটে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে ব্যক্তিগত

ভাবের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। ভক্তি বল ভালবাসা বল একটা ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারিত না। একজন মূর্ত্তিমান রাজা না থাকিলে আমাদের রাজভক্তি থাকিতে পারিত না—কিন্তু সুদ্ধমাত্র রাজ্যতন্ত্রের প্রতি ভক্তি সে য়ুরোপীয় জাতিদের মধ্যেই দেখা যায়। তখন সত্য ও জ্ঞান, গুরু নামক একজন মনুষ্যের আকার ধারণ করিয়া থাকিত। তখন আমরা রাজার জন্য মরিতাম, ব্যক্তিবিশেষের জন্য প্রাণ দিতাম—কিন্তু য়ুরোপীয়েরা কেবলমাত্র একটা ভাবের জন্য একটা জ্ঞানের জন্য মরিতে পারে। তাহারা আফ্রিকার মরুভূমিতে মেরু প্রদেশের তুষারগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। কাহার জন্য? কোনো মানুষের জন্য নহে। বৃহৎ ভাবের জন্য, জ্ঞানের জন্য, বিজ্ঞানের জন্য। অতএব দেখা যাইতেছে য়ুরোপে মানুষের ভক্তি অনুরাগে জ্ঞানে ও ভাবে বিস্তৃত হইতেছে সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের ভাগে কিছু কিছু কম পড়িতেছে। সেই য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তিবিশেষদের চারিদিক হইতে আমাদের শিকড়ের পাক্ প্রতিদিন যেন অল্পে অল্পে খুলিয়া আসিতেছে। এখন মতের অনুরোধে অনেকে পিতামাতাকে ত্যাগ করিতেছেন, এখন প্রত্যক্ষ বাস্তুভিটাটুকু ছাড়িয়া অপ্রত্যক্ষ স্বদেশের প্রতি অনেকের প্রেম প্রসারিত হইতেছে, এবং সুদূর উদ্দেশ্যের জন্য অনেকে জীবন যাপন করিতে অগ্রসর হইতেছেন। এরূপ ভাব যে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইহার কাজ চলিতেছে, ইহার নানা লক্ষণ অল্পে অল্পে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার ভাল মন্দ দুইই আছে। সে-কথা সকল অবস্থা সম্বন্ধেই খাটে। তবে, যখন এই পরিবর্ত্তন একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তখন ইহার মধ্যে যে ভালটুকু আছে সেটা যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, সেই ভালটুকুর উপর যদি অনুরাগ বদ্ধ করিতে পারি, তবে সেই ভালটুকু শীঘ্র শীঘ্র স্ফূর্ত্তি পাইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে, মন্দটা ম্লান হইয়া

যায়। নহিলে, সকল জিনিষের যেমন দস্তুর আছে, মন্দটাই আগেভাগে খুব কণ্টকিত হইয়া সকলের চোখে পড়ে, ভালটা অনেক বিলম্বে গা-ঝাড়া দিয়া উঠে।

আমার কথা ত আমি বলিলাম এখন তোমার কথা তুমি বল। তুমি কালেজে পড় নাই বলিয়া কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিয়ো না। কারণ, তোমারও লেখাতে কালেজের বিলক্ষণ গন্ধ ছাড়ে। সেটা সময়ের প্রভাব। ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন হয় সেটা মিথ্যা কথা নয়। অতএব এখনকার সমাজে বসিয়া তুমি যে নিশ্বাস লইতেছ ও নস্য লইতেছ, তাহাতেই কালেজের অর্দ্ধেক বিদ্যা তোমার নাকে সেঁধোইতেছে। নাক বন্ধ করিতে পারিতেছ না, কেবল নাক তুলিয়াই আছ। যেন পেঁয়াজ রসুনের ক্ষেতের মধ্যে বাস করিতেছ এবং তোমার নাতিরাই তাহার এক একটি হৃষ্টপুষ্ট উৎপন্ন দ্রব্য। কিন্তু ইহা জানিয়ো এ গন্ধ ধুইলে যাইবে না মাজিলে যাইবে না, নাতিগুলোকে একেবারে সমূলে উৎপাটন করিতে পার ত যায়। কিন্তু এ ত আর তোমার পাকা চুল নয়, রক্তবীজের ঝাড়।

সেবক
শ্রীনবীনকিশোর শর্ম্মণঃ।

(৩)

ভায়া, দাদা মহাশয়ের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করিতে পাও বলিয়া যে তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে না, এটা কোনো কাজের কথা নহে। দাদা মহাশয়রা তোমাদের চেয়ে এত বেশী বড় যে তাঁহাদের সঙ্গে ঠাট্টা

তামাসা করিলেও চলে। কেমনতর জান? যেমন ছোট ছেলে বাপের গায়ে পা তুলিয়া দিলে তাহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। কিন্তু তাহা হইতে এমন প্রমাণ হয় না যে বাপের প্রতি সেই ছোট ছেলের ভক্তি নাই, অর্থাৎ নির্ভরের ভাব নাই, অর্থাৎ সে সহজেই বাপকে আপনার চেয়ে বড় মনে করে না। তোমরা তেমনি আমাদেব কাছে এত ছোট যে আমরা নিবাপদে তোমাদের সহিত বেয়াদবী করিতে পারি, এবং অকাতবে তোমাদের বেয়াদবি সহিতে পারি। আর একটা কথা; সন্তানের শুভাশুভ সমস্তই পিতার উপর নির্ভর করিতেছে, এইজন্য স্বভাবতই পিতার স্নেহের সহিত শাসন আছে এবং পুত্রের ভক্তির সহিত ভয় আছে;—পদে পদে কঠোর কর্ত্তব্যপথে সন্তানকে নিয়োগ করিবার জন্য পিতার আদেশ করিতে হয় এবং পুত্রের তাহা পালন করিতে হয়, এই জন্য পিতাপুত্রের মধ্যে আচবণেব শৈথিল্য শোভা পায় না। এই-রূপে পিতার উপরে কঠোর স্নেহের ভার দিয়া দাদা মহাশয় কেবলমাত্র মধুর স্নেহ বিতরণ করেন এবং নাতি নিভয় ভক্তিভরে দাদা মহাশয়ের সহিত আনন্দে হাস্যালাপ কবিতে থাকে। কিন্তু সে হাস্যালাপের মর্ম্মের মধ্যে যদি ভক্তি না থাকে তবে তাহা বেয়াদবির অধম। এত কথা তোমাকে বলিবার আবশ্যক ছিল না, কিন্তু তোমার লেখাব ভঙ্গী দেখিয়া তোমাকে কিঞ্চিৎ সাবধান করিয়া দিতে হয়।

বাস্‌রে! আজ কাল তোমরা এত কথাও কহিতে শিখিয়াছ! এখন একটা কথা কহিলে পাঁচটা কথা শুনিতে হয়! তাহার মধ্যে যদি সব কথা বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলেও এতটা গায়ে লাগিত না। ভাবের মিল থাকিলেও অনেক সময়ে আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারি না বলিয়া বিস্তর মনান্তর উপস্থিত হয়। আমি বুড়ামানুষ, তোমার সমস্ত কথা ঠিক বুঝিয়াছি কি না কে জানে, কিন্তু যেরূপ বুঝিলাম সেইরূপ উত্তর দিতেছি।

স্বকাল, পরকাল, এ এক নূতন কথা তুমি তুলিয়াছ। পরকালটা নূতন নয়—সমুখের এক জোড়া দাঁত বিসর্জ্জন দিয়া অবধি ঐ কালের কথাটাই ভাবিতেছি—কিন্তু স্বকাল আবার কি?

কালের কি কিছু স্থিরতা আছে না কি! আমরা কি ভাসিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি যে, কালস্রোতের উপর হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিব? মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ কি স্রোতের মধ্যবর্ত্তী শৈলের মত কালকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছে না!

আমরা পরিবর্ত্তনের মধ্যে থাকি বলিয়াই একটা স্থির লক্ষ্যের প্রতি বেশী দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নহিলে কিছুক্ষণ বাদে আর কিছুই ঠাহর হয় না—নহিলে আমরা পরিবর্ত্তনের দাস হইয়া পড়ি। পরিবর্ত্তনের খেলনা হইয়া পড়ি। তুমি যেরূপ লিখিয়াছ তাহাতে তুমি পরিবর্ত্তনকেই প্রভু বলিয়াছ, কালকেই কর্ত্তা বলিয়া মানিয়াছ—অর্থাৎ ঘোড়াকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছ এবং আরোহীকেই তাহার অধীন বলিয়া প্রচার করিতেছ। কালের প্রতি ভক্তি এইটেই তুমি সার ধরিয়া লইয়াছ, কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রতি, ধ্রুব আদর্শের প্রতি ভক্তি তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

মনুষ্যের প্রতি প্রেম, পিতার প্রতি ভক্তি, পুত্রের প্রতি স্নেহ—এ যে কেবল পরিবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্র কালবিশেষের ধর্ম্ম, এ-কথা কে বলিতে সাহস করে! এ-ধর্ম্ম সকল কালের উপরেই মাথা তুলিয়া আছে। "উনবিংশ শতাব্দীর" ধূলি উড়াইয়া ইহাকে চোখের আড়াল করিতে পার, তাই বলিয়া ফুঁয়ের জোরে ইহাকে একবারে ধূলিসাৎ করিতে পার না!

যদি সত্যই এমন দেখিয়া থাক যে এখনকার কালে পিতা মাতাকে কেহ ভক্তি করে না, অতিথিকে কেহ যত্ন করে না, প্রতিবেশীদিগকে কেহ সাহায্য করে না—তবে এখনকার কালের জন্য শোক কর, কালের দোহাই দিয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়ো না।

অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বর্ত্তমানকে সংযত করিতে হয়। যদি ইচ্ছা কর ত চোখ বুজিয়া ছুটিবার সুখ অনুভব করিতে পার। কিন্তু অবিলম্বে ঘাড় ভাঙিবার সুখটাও টের পাইবে।

বর্ত্তমানকাল ছুটিতেছে বলিয়াই শুদ্ধ অতীত কালের এত মূল্য। অতীতে কালের প্রবল বেগ প্রচণ্ড গতি সংহত হইয়া যেন স্থির আকার ধারণ করিয়াছে। কালকে ঠাহর করিতে হইলে অতীতের দিকে চাহিতে হয়। অতীত বিলুপ্ত হইলে বর্ত্তমানকালকে কেই বা চিনিতে পারে, কেই বা বিশ্বাস করে, তাহাকে সামলায় কাহার সাধ্য! কেন না, চিনিতে পারিলে জানিতে পারিলে তবে বশ করা যায়। যাহাকে জানিনা সে আমাদের প্রভু হইয়া দাঁড়ায়। অতএব পরিবর্ত্তনশীল কালকে ভয় করিয়া চল, তাহাকে বশ করিতে চেষ্টা কর, তাহাকে নিতান্ত বিশ্বাস করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়ো না।

যাহা থাকে না, চলিয়া যায়, মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাকে আপনার বলিবে কি করিয়া! একখণ্ড ভূমিকে আপনার বলা যায়, কিন্তু জলের স্রোতকে আপনার বলিবে কে? তবে আবার স্ব-কাল জিনিষটা কি?

তুমি লিখিয়াছ আমাদের সেকালে ব্যক্তির প্রতিই ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি বদ্ধ ছিল, ভাবের প্রতি ভক্তি প্রীতি ছিল না। ব্যক্তির প্রতি ভক্তি প্রীতি কিছু মন্দ নহে সে খুব ভালই, সুতরাং আমাদের কালে যে সেটা খুব বলবান ছিল সে-জন্য আমরা লজ্জিত নহি। কিন্তু তাই বলিয়া যদি বল যে, ভাবের প্রতি আমাদের কালের লোকের ভক্তি প্রীতি ছিল না তবে সে-কথাটা আমাকে অস্বীকার করিতে হয়। আমাদের কালে দুইই ছিল, এবং উভয়েই পরস্পর বনিবনাও করিয়া বাস করিত। একটা উদাহরণ দিই। আমাদের দেশে যে স্বামীপ্রীতি বা স্বামীভক্তি ছিল (এখনও হয়ত আছে) তাহা কি? তাহা কেবল-

মাত্র ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রীতি বা ভক্তি নয়, তাহা ব্যক্তিবিশেষকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান, তাহা স্বামী নামক ভাবগত অস্তিত্বের প্রতি ভক্তি। ব্যক্তিবিশেষ উপলক্ষ্য মাত্র, স্বামীই প্রধান লক্ষ্য। এই জন্য ব্যক্তির ভাল মন্দের উপর ভক্তির তারতম্য হইত না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীই সমান পূজ্য। য়ুরোপীয় স্ত্রীর ভক্তি প্রীতি ব্যক্তির মধ্যেই বদ্ধ, ভাবে গিয়া পৌঁছায় না। এই জন্য স্বামী নামক ব্যক্তিবিশেষের দোষ গুণ অনুসারে তাহার ভক্তি প্রীতি নিয়মিত হয়। এই জন্যই সেখানে বিধবাবিবাহে দোষ নাই, কারণ সেখানকার স্ত্রীরা ভাবকে বিবাহ করে না, ব্যক্তিকেই বিবাহ করে, সুতরাং ব্যক্তিত্বের অবসানেই স্বামীত্বের অবসান হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিগত সম্পর্কই এইরূপ সুগভীর ভাবের উপরে স্থায়ী।

কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেন, অন্যান্য বিষয় দেখ না। আমাদের ব্রাহ্মণেরা কি সমাজের হিতার্থ সমাজ ত্যাগ করেন নাই? রাজারা কি ধর্ম্মের জন্য বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য ত্যাগ করেন নাই? (য়ুরোপের রাজারা তাড়া না খাইলে কখনো এমন কাজ করেন?) ঋষিরা কি জ্ঞানের জন্য অমরতার জন্য সংসারের সমস্ত সুখ ত্যাগ করেন নাই? পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র যৌবরাজ্য ত্যাগ, সত্যরক্ষার জন্য হরিশ্চন্দ্র স্বর্গত্যাগ, পরহিতের জন্য দধীচি দেহত্যাগ করেন নাই? কর্ত্তব্য অর্থাৎ ভাবমাত্রের জন্য আত্মত্যাগ আমাদের দেশে ছিল না কে বলে? কুকুর যেরূপ অন্ধ আসক্তিতে মনিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, সীতা কি সেইভাবে রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন, না মহৎ ভাবের পশ্চাতে মনুষ্য যেরূপ অকাতরে বিপদ ও মৃত্যুর মুখে ছুটিয়া যায় সীতা সেইরূপ ভাবে গিয়াছিলেন?

তবে কি ব্যক্তির প্রতি ও ভাবের প্রতি ভক্তি একই সময়ে থাকিতে পারে না? বর্ত্তমানের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া "পারে

না” বলিয়া, এমন একটি রত্ন অবহেলায় হারাইয়ো না। এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, কাহারও বা এক ভাবের প্রতি ভক্তি, কাহারও বা আর এক ভাবের প্রতি ভক্তি। কেহ বা লৌকিক স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে পারে, কেহ বা আত্মার স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে পারে।

এ-সকল কথা তোমাদের বয়সে আমরা বুঝিতে পারিতাম না ইহা স্বীকার করিতে হয়—কিন্তু তোমরা অনেক কুটকচালে কথা বুঝিতে পার বলিয়াই এতখানি বকিলাম।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্ম্মণঃ।

(৪)

শ্রীচরণেষু—

দাদা মশায়, তোমার চিঠি ক্রমেই হেঁয়ালি হইয়া উঠিতেছে। আমাদের চোখে এ চিঠি অত্যন্ত ঝাপ্‌সা ঠেকে। কোথায় রামচন্দ্র হরিশ্চন্দ্র দধীচি, অতদূরে আমাদের দৃষ্টি চলে না। তোমরাই ত বল আমাদের দূরদর্শিতা নাই—অতএব দূরের কথা দূর করিয়া নিকটের কথা তুলিলেই ভাল হয়।

আমরা যে মস্ত জাতি, আমাদের মত এত বড় জাতি যে পৃথিবীর আর কোথাও মেলে না, তাহাতে আমাদের মনে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। বেদ বেদান্ত আগম নিগম পুরাণ হইতে ইহা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। আমাদের বেলুন ছিল, রেল-গাড়ি ছিল, আমাদের ষ্টাইলোগ্রাফ্‌ পেন্‌ ছিল গণপতি তাহাতে মহাভারত লিখিয়াছিলেন,

ডারুইনের বহুপূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহাদের পূর্ব্বতর পুরুষদিগকে বানর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় সিদ্ধান্তই শাণ্ডিল্য ভৃগু গৌতমের সম্পূর্ণ জানা ছিল, ইহা সমস্তই মানিলাম, কিন্তু তাই বলিয়াই যে আমরা আমাদের কৌলিন্য লইয়া স্ফীত হইতে থাকিব, সেই সুদূর কুটুম্বিতার মধ্যেই গুটি মারিয়া বসিয়া থাকিব, কাছাকাছির সহিত কোনো সম্পর্ক রাখিব না, এমন হইতে পারে না। বাল্যকালে এক দিন উত্তমরূপে পোলাও খাওয়া হইয়াছিল বলিয়া যে অবশিষ্ট জীবন ভাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। আমাদের বৈদিক পৌরাণিক যুগ যে চলিয়া গেছে, এ বড় দুঃখের বিষয়, এখন সকাল সকাল এই দুঃখ সারিয়া লইয়া বর্ত্তমান যুগের কাজ করিবার জন্য একটু সময় করিয়া লওয়া আবশ্যক।

আমি যখন বলিয়াছিলাম ভাবের প্রতি আমাদের দেশের লোকেব নিষ্ঠা নাই, ব্যক্তির প্রতিই আসক্তি, তখন আমি রামচন্দ্র হরিশ্চন্দ্র দধীচির কথা মনেও করি নাই—কীটের মত যেখানকার যত পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে আমার উৎসাহ নাই। আমি অপেক্ষাকৃত আধুনিকের কথাই বলিতেছি। তর্ক বিতর্কের প্রবৃত্তি দূব করিয়া একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, মহৎ ভাবকে উপন্যাসগত কুহেলিকা জ্ঞান না করিয়া মহৎভাবকে সত্য মনে করিয়া, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহার জন্য আমাদের দেশে কয় জন লোক আত্মসমর্পণ করে? কেবল দলাদলি, কেবল আমি আমি আমি এবং অমুক অমুক অমুক করিয়াই মরিতেছি। আমাকে এবং অমুককে অতিক্রম করিয়াও যে, দেশের কোনো কাজ কোনো মহৎ অনুষ্ঠান বিরাজ করিতে পারে ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। এইজন্য আপন আপন অভিমান লইয়াই আমরা থাকি। আমাকে বড় চৌকী দেয় নাই, অতএব এ-সভায় আমি থাকিব না, আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে নাই অতএব ও-কাজে আমি হাত দিতে পারি না, সে-

সমাজের সেক্রেটরী অমুক অতএব সে-সমাজে আমার থাকা শোভা পায় না আমরা কেবল এই ভাবিয়াই মরি। সুপারিসের খাতির এড়াইতে পারি না, চক্ষুলজ্জা অতিক্রম করিতে পারি না। আমার একটা কথা অগ্রাহ্য হইলে সে অপমান সহ্য করিতে পারি না। দুর্ভিক্ষ নিবারণের উদ্দেশ্যে কেহ যদি আমার সাহায্য লইতে আসে, আমি পাঁচ টাকা দিয়া মনে করি তাহাকেই ভিক্ষা দিলাম, তাহাকেই সবিশেষ বাধিত করিলাম, সে এবং তাহার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ সংখ্যক পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে মনে মনে কৃতজ্ঞতা দাবী করিয়া থাকি। নহিলে মনের তৃপ্তি হয় না—কোনো ব্যক্তিবিশেষকে বাধিত করিলাম না —আমি রহিলাম কলিকাতার এক কোণে, বীরভূমের এক কোণে এক ব্যক্তি আমার টাকায় মাসখানেক ধরিয়া দুই মুঠা ভাত খাইয়া লইল— ভাবি ত আমার গরজ! পরোপকারী বলিয়া নাম বাহির হয় কার? যে ব্যক্তি আশ্রিতদের উপকার করে অর্থাৎ, এক জন আসিয়া কহিল— মহাশয় আপনার হাত ঝাড়িলে পর্ব্বত, আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে আমার একটা গতি করিতে পারেন—আমি আপনাদেরই আশ্রিত; মহামহিম মহিমার্ণব অমনি অবহেলে গুড়গুড়ি হইতে ধূমাকর্ষণপূর্ব্বক অকাতরে বলিলেন—"আচ্ছা!" বলিয়া পত্রযোগে একজন বিশ্বাস-পরায়ণ বান্ধবের ঘাড়ে সেই অকর্ম্মণ্য অপদার্থকে নিক্ষেপ করিলেন। আর একজন হতভাগ্য অগ্রে তাঁহার কাছে না গিয়া পাঁচু বাবুর কাছে গিয়াছিল, এই অপরাধে তাহাকে কাণা কড়ি সাহায্য করা চুলায় যাক্, বাক্যযন্ত্রণায় তাহাকে নাকের জলে চোখের জলে করিয়া তবে ছাড়িয়া দিলেন। আপনার স্থূল উদরটুকু ধারণ করিয়া এবং উদরের চতুষ্পার্শ্বে সহচর অনুচরগণকে চক্রাকারে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যে-ব্যক্তি বিপুল শনিগ্রহের মত বিরাজ করিতে থাকে আমাদের এখানে সে-ব্যক্তি একজন মহৎ লোক। উদারতার সীমা উদরের চারি পার্শ্বের মধ্যেই

অবসিত। আমাদের মহত্ত্ব ব্যাপক দেশে ব্যাপক কালে স্থান পায় না। অত কথায় কাজ কি, উদার মহত্ত্বকে আমরা কোনো মতে বিশ্বাস করিতেই পারি না। যদি দেখি কোনো এক ব্যক্তি টাকা-কড়ির দিকে খুব বেশী মনোযোগ না দিয়া খানিকটা করিয়া সময় দেশের কাজে ব্যয় করে, তবে তাহাকে বলি "হুজুকে"। আমাদের স্ফীত ক্ষুদ্রত্বের নিকট বড় কাজ একটা হুজুক বই আর কিছুই নয়। আমরা টাকা-কড়ি ক্ষুধাতৃষ্ণা এ-সকলের একটা অর্থ বুঝিতে পারি, ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির বশে এবং সঙ্কীর্ণ কর্ত্তব্যজ্ঞানে কাজ করাকেই বুদ্ধিমান প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির লক্ষণ বলিয়া জানি—কিন্তু মহৎ কার্য্যের উৎসাহে আত্মসমর্পণ করার কোনো অর্থই আমরা খুঁজিয়া পাই না। আমরা বলি, ও-ব্যক্তি দল বাঁধিবার জন্য বা নাম করিবার জন্য বা কোনো একটা গোপনীয় উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে—স্পষ্ট করিয়া কিছু যদি না বলিতে পারি ত বলি, ওর একটা মতলব আছে। মতলব ত আছেই! কিন্তু মতলব মানে কি কেবলই নিজের উদর বা অহঙ্কার তৃপ্তি, ইহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোনো উচ্চতর মতলব আমরা কি কল্পনাও করিতে পারি না! এম্‌নি আমাদের জাতির হৃদয়গত বদ্ধমূল ক্ষুদ্রতা! কিন্তু এদিকে দেখ রামহরি বা কালাচাঁদের উপকারের জন্য কেহ প্রাণপণ করিতেছে এরূপ নিঃস্বার্থভাব দেখিলে আমরা তাহার প্রশংসা করিয়াই থাকি, অথচ, মানবজাতির উপকারের জন্য আপিষ কামাই করা—এরূপ অবিশ্বাসজনক হাস্যজনক প্রস্তাব আপিষ-কোটর-বাসী ক্ষুদ্র বাঙালী-পেচকের নিকটে নিতান্ত রহস্য বলিয়া বোধ হয়। সামাজিক প্রবন্ধ দেখিলে বাঙালী পাঠকেরা ক্রমাগত ঘ্রাণ করিয়া করিয়া সন্ধান করিতে থাকে ইহা কোন্ ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে লিখিত! সমাজের কোনো কুরুচি বা কদাচারের বিরুদ্ধে কেহ যে রাগ করিতে পারে ইহা তেমন সম্ভব বোধ হয় না—এই উপলক্ষ করিয়া কোনো শত্রুর প্রতি

আক্রমণ করা ইহাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত, মনুষ্য-স্বভাব অর্থাৎ বাঙালী-স্বভাবসঙ্গত বলিয়া সকলের বোধ হয়। এই জন্য অনেক বাংলা কাগজে ব্যক্তিবিশেষের কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া উঞ্ছবৃত্তি করা হয়—যা'কে তা'কে ধরিয়া তাহার উকুন বাছিয়া বা উকুন বাছিবার ভাণ করিয়া বাঙালী দর্শক সাধারণের পরম আমোদ উৎপাদন করা হয়।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই ত বলিয়াছিলাম আমরা ব্যক্তির জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতেও পারি। কিন্তু মহৎ ভাবের জন্য সিকি পয়সাও দিতে পারি না। আমরা কেবল ঘরে বসিয়া বড় কথা লইয়া হাসি তামাসা করিতে পারি, বড় লোককে লইয়া বিদ্রূপ করিতে পারি, তার পরে ফুড়ফুড় করিয়া খানিকটা তামাক টানিয়া তাস খেলিতে বসি। আমাদের কি হবে তাই ভাবি? অথচ ঘরে বসিয়া আমাদের অহঙ্কার অভিমান খুব মোটা হইতেছে। আমরা ঠিক দিয়া রাখিয়াছি আমরা সমুদয় সভ্য জাতির সমকক্ষ। আমরা না পড়িয়া পণ্ডিত, আমরা না লড়িয়া বীর, আমরা ধাঁ করিয়া সভ্য, আমরা ফাঁকি দিয়া পেট্রিয়ট—আমাদের রসনার অদ্ভুত রাসায়নিক প্রভাবে জগতে যে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইবে আমরা তাহারই জন্যে প্রতীক্ষা করিয়া আছি; সমস্ত জগৎও সেই দিকে সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিয়া আছে। দাদামশায়, আর হরিশ্চন্দ্র রামচন্দ্র দধীচির কথা পাড়িয়া ফল কি বল শুনি? উহাতে আমাদের ফুটন্ত বাগ্মিতার মুখে ফোড়ন দেওয়া হয় মাত্র—আর কি হয়?

আমরা কেবল আপনাকে এ'কে ও'কে তা'কে এবং এটা ওটা সেটা লইয়া মহা ধূমধাম ছটফট্ বা খুঁৎ খুঁৎ করিয়া বেড়াইতেছি—প্রকৃত বীরত্ব, উদার মনুষ্যত্ব, মহত্ত্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনের জন্য হৃদয়ের অনিবার্য্য আবেগ, ক্ষুদ্র বৈষয়িকতার অপেক্ষা সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ঔৎকর্ষ—এ-সকল আমাদের দেশে কেবল কথারকথা হইয়া রহিল—দ্বার নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া জাতির হৃদয়ের

মধ্যে ইহারা প্রবেশ করিতে পারিল না—কেবল বাষ্পময় ভাষার প্রতিমা-গুলি আমাদের সাহিত্যে কুজ্ঝটিকা রচনা করিতে লাগিল।

আমরা আশা করিয়া আছি ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে এ-সকল সঙ্কীর্ণতা ক্রমে আমাদের মন হইতে দূর হইয়া যাইবে। এই শিক্ষার প্রতি বিরাগ জন্মাইয়া দিয়া ইহার অভ্যন্তরস্থিত ভাল জিনিষটুকু দেখিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হয় না।

সেবক

শ্রীনবীনকিশোর শর্ম্মণঃ।

(৫)

তোমার চিঠি পড়িয়া বড় খুসী হইলাম। বাস্তবিক, বাঙালীজাতি যেরূপ চালাকী করিতে শিখিয়াছে, তাহাতে তাহাদের কাছে কোনো গম্ভীর বিষয় বলিতে বা কোনো শ্রদ্ধাস্পদের নাম করিতে মনের মধ্যে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। আমাদের এককালে গৌরবের দিন ছিল, আমাদের দেশে এককালে বড় বড় বীরসকল জন্মিয়াছিলেন—কিন্তু বাঙালীর কাছে ইহার কোনো ফল হইল না। তাহারা কেবল ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুনকে পুরাতত্ত্বের কুলুঙ্গি হইতে পাড়িয়া ধূলা ঝাড়িয়া সভাস্থলে পুঁতুলনাচ দেখায়। আসল কথা, ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণ আমাদের দেশে মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে বাতাসে ছিলেন, সে-বাতাস এখন আর নাই। স্মৃতিতে বাঁচিতে হইলেও তাহার খোরাক চাই। নাম মনে করিয়া রাখা ত স্মৃতি নহে, প্রাণ ধরিয়া রাখাই স্মৃতি।

কিন্তু প্রাণ জাগাইয়া রাখিতে হইলেই তাহার উপযোগী বাতাস চাই, তাহার উপযোগী খাদ্য চাই। আমাদের হৃদয়ের তপ্ত রক্ত সেই স্মৃতির শিরার মধ্যে প্রবাহিত হওয়া চাই। মনুষ্যত্বের মধ্যেই ভীষ্ম দ্রোণ বাঁচিয়া আছেন। আমরা ত নকল মানুষ! অনেকটা মানুষের মত! ঠিক মানুষের মত খাওয়া দাওয়া করি, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াই, হাই তুলি ও ঘুমোই—দেখিলে কে বলিবে যে মানুষ নই! কিন্তু ভিতরে মনুষ্যত্ব নাই। যে-জাতির মজ্জার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, সে-জাতির কেহ মহত্ত্বকে অবিশ্বাস করিতে পারে না, মহৎ আশাকে কেহ গাঁজাখুরী মনে করিতে পারে না, মহৎ অনুষ্ঠানকে কেহ হুজুক বলিতে পারে না, সেখানে সঙ্কল্প কার্য্য হইয়া উঠে, কার্য্য সিদ্ধিতে পরিণত হয়। সেখানে জীবনের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায়। সে-জাতিতে সৌন্দর্য্য ফুলের মত ফুটিয়া উঠে, বীরত্ব ফলের মত পক্কতা প্রাপ্ত হয়। আমার বিশ্বাস আমরা যতই মহত্ত্ব উপার্জ্জন করিতে থাকিব, আমাদের হৃদয়ের বল যতই বাড়িয়া উঠিবে—আমাদের দেশের বীরগণ ততই পুনর্জ্জীবন লাভ করিবেন। পিতামহ ভীষ্ম আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া উঠিবেন। আমাদের সেই নূতন জীবনের মধ্যে আমাদের দেশের প্রাচীন জীবন জীবন্ত হইয়া উঠিবে। নতুবা মৃত্যুর মধ্যে জীবনের উদয় হইবে কি করিয়া? বিদ্যুৎ প্রয়োগে মৃতদেহ জীবিতের মত কেবল অঙ্গভঙ্গী ও মুখভঙ্গী করে মাত্র। আমাদের দেশে সেই বিচিত্র ভঙ্গিমার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু হায় হায়, কে আমাদিগকে এমন করিয়া নাচাইতেছে! কেন আমরা ভুলিয়া যাইতেছি যে আমরা নিতান্ত অসহায়! আমাদের এত সব উন্নতির মূল কোথায়! এসব উন্নতি রাখিব কিসের উপরে! রক্ষা করিব কি উপায়ে! একটু নাড়া খাইলেই দিন-দুয়ের সুখস্বপ্নের মত সমস্তই যে কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে! অন্ধকারের মধ্যে বঙ্গদেশের উপরে ছায়াবাজীর উজ্জ্বল ছায়া পড়িয়াছে, তাহাকেই স্থায়ী

উন্নতি মনে করিয়া আমরা ইংরাজি ফেশানে করতালি দিতেছি। উন্নতির চাকচিক্য লাভ করিয়াছি কিন্তু উন্নতিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার ও রক্ষা করিবার বিপুল বল কই লাভ করিতেছি? আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখ, সেখানে সেই জীর্ণতা, দুর্ব্বলতা, অসম্পূর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, অসত্য অভিমান, অবিশ্বাস, ভয়। সেখানে চপলতা, লঘুতা, আলস্য. বিলাস। দৃঢ়তা নাই, উদ্যম নাই, কারণ সকলেই মনে করিতেছেন, সিদ্ধি হইয়াছে, সাধনার আবশ্যক নাই। কিন্তু যে সিদ্ধি সাধনা ব্যতীত হইয়াছে তাহাকে কেহ বিশ্বাস করিয়ো না। তাহাকে তোমার বলিয়া মনে করিতেছ কিন্তু সে কখনই তোমার নহে। আমরা উপার্জ্জন করিতে পারি, কিন্তু লাভ করিতে পারি না। আমরা জগতের সমস্ত জিনিষকে যতক্ষণ না আমার মধ্যে ফেলিয়া আমার করিয়া লইতে পারি, ততক্ষণ আমরা কিছুই পাই না। ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িলেই তাহাকে পাওয়া বলে না। আমাদের চক্ষের স্নায়ু সূর্য্যকিরণকে আমাদের উপযোগী আলো আকারে গড়িয়া লয়, তা না হইলে আমরা অন্ধ; আমাদের অন্ধ চক্ষুর উপরে সহস্র সূর্য্যকিরণ পড়িলেও কোনো ফল নাই। আমাদের হৃদয়ের সেই স্নায়ু কোথায়? এ পক্ষাঘাতের আরোগ্য কিসে হইবে? আমরা সাধনা কেন করি না? সিদ্ধির জন্যে আমাদের মাথাব্যথা নাই বলিয়া। সেই মাথাব্যথাটা গোড়ায় চাই।

অর্থাৎ বাতিকের আবশ্যক। আমাদের শ্লেষ্মাপ্রধান ধাত, আমাদের বাতিকটা আদবেই নাই। আমরা ভারি ভদ্র, ভারি বুদ্ধিমান্, কোনো বিষয়ে পাগ্‌লামি নাই। আমরা পাশ করিব, রোজকার করিব, ও তামাক খাইব। আমরা এগোইব না, অনুসরণ করিব; কাজ করিব না, পরামর্শ দিব; দাঙ্গাহাঙ্গামাতে নাই, কিন্তু মকদ্দমা মাম্‌লা ও দলাদলিতে আছি। অর্থাৎ হাঙ্গামের অপেক্ষা হুজ্জৎটা আমাদের

কাছে যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। লড়াইয়ের অপেক্ষা পলায়নেই পিতৃযশ রক্ষা হয় এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। এইরূপ আত্যন্তিক স্নিগ্ধভাব ও মজ্জাগত শ্লেষ্মার প্রভাবে নিদ্রাটা আমাদের কাছে পরম রমণীয় বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্নটাকেই সত্যের আসনে বসাইয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করি।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে আমাদের প্রধান আবশ্যক বাতিক। সেদিন একজন বৃদ্ধ বাতিকগ্রস্তের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তিনি বায়ুভরে একেবারে কাৎ হইয়া পড়িয়াছেন—এমন কি অনেক সময়ে বায়ুর প্রকোপ তাঁহার আয়ুর প্রতি আক্রমণ করে। তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ আলোচনা করিয়া স্থির করিলাম, যে, "আর কিছু না, আমাদের দেশে একটি বাতিকবর্দ্ধনী সভার আবশ্যক হইয়াছে।" সভার উদ্দেশ্য আর কিছু নয় কতকগুলা ভালমানুষের ছেলেকে ক্ষেপাইতে হইবে। বাস্তবিক, প্রকৃত ক্ষেপা ছেলেকে দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

বায়ুর মাহাত্ম্য কে বর্ণনা করিতে পারে! যে-সকল জাত উনবিংশ শতাব্দীর পরে উনপঞ্চাশ বায়ু লাগাইয়া চলিয়াছেন, আমরা সাবধানীরা কবে তাঁহাদের নাগাল পাইব। আমাদের যে অল্প একটু বায়ু আছে, সভার নিয়ম রচনা করিতে ও বক্তৃতা দিতেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায়।

মহৎ আশা, মহৎ ভাব, মহৎ উদ্দেশ্যকে সাবধান বিষয়ী লোকেরা বাষ্পের ন্যায় জ্ঞান করেন। কিন্তু এই বাষ্পের বলেই উন্নতির জাহাজ চলিতেছে, এই বাষ্পকে খাটাইতে হইবে, এই বায়ুকে পালে আটক করিতে হইবে। এমন তুমুল শক্তি আর কোথায় আছে! আমাদের দেশে এই বাষ্পের অভাব বায়ুর অভাব। আমরা উন্নতির পালে একটুখানি ফুঁ দিতেছি, যতখানি গাল ফুলিতেছে ততখানি পাল ফুলিতেছে না।

বৃহৎ ভাবের নিকটে আত্মবিসর্জ্জন করাকে যদি পাগ্‌লামি বলে, তবে সেই পাগলামি এককালে প্রচুর পরিমাণে আমাদের ছিল। ইহাই প্রকৃত বীরত্ব। কর্ত্তব্যের অনুরোধে রাম যে রাজ্য ছাড়িয়া বনে গেলেন তাহাই বীরত্ব, এবং সীতা ও লক্ষ্মণ যে তাঁদের অনুসরণ করিলেন, তাহাও বীরত্ব। ভরত যে রামকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন, তাহা বীরত্ব, এবং হনুমান যে প্রাণপণে রামের সেবা করিয়াছিলেন, তাহাও বীরত্ব। হিংসা অপেক্ষা ক্ষমায় যে অধিক বীরত্ব, গ্রহণের অপেক্ষা ত্যাগে অধিক বীরত্ব, এই কথাই আমাদের কাব্যে ও শাস্ত্রে বলিতেছে। পালোয়ানীকে আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বড় জ্ঞান করিত না। এই জন্য বাল্মীকির রাম রাবণকে পরাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, রাবণকে ক্ষমা করিয়াছেন। রাম রাবণকে দুইবার জয় করিয়াছেন। একবার বাণ মারিয়া, একবার ক্ষমা করিয়া। কবি বলেন, তন্মধ্যে শেষের জয়ই শ্রেষ্ঠ। হোমরের একিলিস পরাভূত হেক্টরের মৃতদেহ ঘোড়ার লেজে বাঁধিয়া সহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, রামে একিলিসে তুলনা কর। য়ুরোপীয় মহাকবি হইলে পাণ্ডবদের যুদ্ধ জয়েই মহাভারত শেষ করিতেন, কিন্তু আমাদের ব্যাস বলিলেন, রাজ্য গ্রহণ করায় শেষ নহে রাজ্য ত্যাগ করায় শেষ। যেখানে সব শেষ তাহাই আমাদের লক্ষ্য ছিল। কেবল তাহাই নহে আমাদের কবিরা পুরস্কারেরও লোভ দেখান নাই। ইংরাজেরা Utilitarian, কতকটা দোকানদার, তাই তাঁহাদের শাস্ত্রে Poetical Justice নামক একটা শব্দ আছে, তাহার অর্থ দেনা পাওনা, সৎ-কাজের দরদাম করা। আমাদের সীতা চিরদুঃখিনী—রাম লক্ষ্মণের জীবন দুঃখে কষ্টে শেষ হইল। এত বড় অর্জ্জুনের বীরত্ব কোথায় গেল, অবশেষে দস্যুদল আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে যাদব রমণীদের কাড়িয়া লইয়া গেল, তিনি গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না। পঞ্চপাণ্ডবের সমস্ত জীবন দারিদ্র্যে দুঃখে শোকে

অরণ্যে কাটিয়া গেল, শেষেই বা কি সুখ পাইলেন! হরিশ্চন্দ্র যে এত কষ্ট পাইলেন, এত ত্যাগ করিলেন, অবশেষে কবি তাঁহার কাছ হইতে পুণ্যের শেষ পুরস্কার স্বর্গও কাড়িয়া লইলেন। ভীষ্ম যে রাজপুত্র হইয়া সন্ন্যাসীর মত জীবন কাটাইলেন, তাঁহার সমস্ত জীবনে সুখ কোথায়! সমস্ত জীবন যিনি আত্ম-ত্যাগের কঠিন শয্যায় শুইয়াছিলেন মৃত্যুকালে তিনি শরশয্যায় বিশ্রাম লাভ করিলেন!

এককালে মহৎভাবের প্রতি আমাদের দেশের লোকের এত বিশ্বাস এত নিষ্ঠা ছিল! তাঁহারা মহত্ত্বকেই মহত্ত্বের পরিণাম বলিয়া জানিতেন, ধর্ম্মকেই ধর্ম্মের পুরস্কার জ্ঞান করিতেন।

আর আজকাল! আজকাল আমাদের এমনি হইয়াছে যে কেরাণীগিরি ছাড়া আর কিছুরই উপরে আমাদের বিশ্বাস নাই—এমন কি বাণিজ্যকেও পাগ্‌লামী জ্ঞান করি! দরখাস্তকে ভবসাগরের তরণী করিয়াছি, নাম সহি করিয়া আপনাকে বীর মনে করিয়া থাকি।

আজ তোমাতে আমাতে ভাব হইল ভাই! মহত্ত্বের একাল আর সেকাল কি? যাহা ভাল তাহাই আমাদের হৃদয় গ্রহণ করুক্, যেখানে ভাল সেখানেই আমাদের হৃদয় অগ্রসর হউক্! আমাদের লঘুতা, চপলতা, সঙ্কীর্ণতা দূরে যাক্! অজ্ঞতা ও ক্ষুদ্রতা হইতে প্রসূত বাঙালী-সুলভ অভিমানে মোটা হইয়া চক্ষু রুদ্ধ করিয়া আপনাকে সকলের চেয়ে বড় মনে না করি ,ও মহৎ হইবার আগে দেশ-কাল-পাত্রনির্ব্বিশেষে মহত্তের চরণের ধূলি লইতে পারি এমন বিনয় লাভ করি।

শুভাশীর্ব্বাদক

শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্ম্মণঃ

(৬)

শ্রীচরণেষু—

দাদা মহাশয়, এবার কিছুদিন ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। এই সুদূরবিস্তৃত মাঠ এই অশোকের ছায়ায় বসিয়া আমাদের সেই কলিকাতা সহরকে একটা মস্ত ইঁটের খাঁচা বলিয়া মনে হইতেছে। শত সহস্র মানুষকে একটা বড় খাঁচায় পূরিয়া কে যেন হাটে বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। স্বভাবের গীত ভুলিয়া সকলেই কিচিকিচি ও খোঁচাখুঁচি করিয়া মরিতেছে। আমি সেই খাঁচা ছাড়িয়া উড়িয়াছি, আমি হাটে বিকাইতে চাহি না।

গাছপালা নহিলে আমিত বাঁচি না—আমি ষোল আনা Vegetarian। আমি কায়মনে উদ্ভিদ্ সেবন করিয়া থাকি। ইঁট কাঠ চূণ সুরকি মৃত্যু-ভাবের মত আমাব উপর চাপিয়া থাকে। হৃদয় পলে পলে মরিতে থাকে। বড় বড় ইমাবৎগুলো তাহাদের শক্ত শক্ত কড়ি বরগা মেলিয়া হাঁ করিয়া আমাকে গিলিয়া ফেলে। প্রকাণ্ড কলিকাতাটার কঠিন জঠরের মধ্যে আমি যেন একবারে হজম হইয়া যাই। কিন্তু এখানে এই গাছপালাব মধ্যে প্রাণের হিল্লোল। হৃদয়ের মধ্যে যেখানে জীবনেব সরোবর আছে, প্রকৃতির চারিদিক হইতে সেখানে জীবনের স্রোত আসিয়া মিশিতে থাকে।

বঙ্গদেশ এখান হইতে কত শত ক্রোশ দূরে! কিন্তু এখান হইতে বঙ্গভূমির এক নূতন মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। যখন বঙ্গদেশের ভিতরে বাস করিতাম, তখন বঙ্গদেশের জন্য বড় আশা হইত না। তখন মনে হইত বঙ্গদেশ গোঁফে তেল গাছে কাঁঠালের দেশ। যত-বড়-না-মুখ ততবড় কথার দেশ। পেটে পিলে, কানে কলম ও মাথায় শাম্‌লার দেশ। মনে হইত এখানে বিচি গুলাই দেখিতে দেখিতে তেরো হাত হইয়া কাঁকুড়কে অতিক্রম করিয়া উঠে। এখানে পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা

হাত পা নাড়িয়া কেবল একটা প্রহসন অভিনয় করিতেছে, এবং মনে করিতেছে দর্শকেরা শুদ্ধ কেবল আড়ি করিয়া হাসিতেছে, হাসির কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু আজি এই সহস্রক্রোশ ব্যবধান হইতে বঙ্গভূমির মুখের চতুর্দ্দিকে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্মণ্ডল দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশ আজ মা হইয়া বসিয়াছেন—তাঁহার কোলে বঙ্গবাসী নামে এক সুন্দর শিশু—তিনি হিমালয়ের পদপ্রান্তে সাগরের উপকূলে তাঁহার শ্যামল কানন তাঁহার পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের তীরে এই শিশুটি কোলে করিয়া লালন করিতেছেন। এই সন্তানের মুখের দিকে মাতা অবনত হইয়া চাহিয়া আছেন, ইহাকে দেখিয়া তাঁহার মুখে আশা ও আনন্দের আভা দীপ্তি পাইয়া উঠিয়াছে। সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া আমি মায়ের মুখের সেই আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি। আমি আশ্বাস পাইতেছি এ সন্তান মরিবে না। বঙ্গভূমি এই সন্তানটিকে মানুষ করিয়া ইহাকে একদিন পৃথিবীর কাজে উৎসর্গ করিতে পারিবেন। বঙ্গভূমির কোল হইতে আজ মাঝে মাঝে শিশুর হাসি শিশুর ক্রন্দন শুনিতেছি—বঙ্গভূমির সহস্র নিকুঞ্জ এতদিন নিস্তব্ধ ছিল, বঙ্গভবনে শিশুর কণ্ঠধ্বনি এতদিন শুনা যায় নাই, এতদিন এই ভাগীরথীর উভয় তীর কেবল শ্মশান বলিয়া মনে হইত। আজ বঙ্গভূমির আনন্দ উৎসব ভারতবর্ষের চারিদিক হইতে শুনা যাইতেছে। আজ ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে যে নব জাতির জন্ম-সংগীত গান হইতেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্ত পশ্চিমঘাটগিরির সীমান্ত দেশে বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে থাকিয়া যাহা কেবলমাত্র অর্থহীন কোলাহল মনে হইত এখানে তাহার এক বৃহৎ অর্থ দেখিতে পাইতেছি। এই দূর হইতে বঙ্গদেশের কেবল বর্ত্তমান নহে ভবিষ্যৎ, প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিমাত্র নহে সুদূর সম্ভাবনাগুলি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি। তাই আমার হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আশার সঞ্চার হইতেছে।

মনের আবেগে কথাগুলো কিছু বড় হইয়া পড়িল। তোমার আবার বড় কথা সয় না। ছোটকথা সম্বন্ধে তোমার কিঞ্চিৎ গোঁড়ামি আছে—সেটা ভাল নয়। যাইহোক্ তোমাকে বক্তৃতা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আসল কথা কি জান? এতদিন বঙ্গদেশ সহরতলিতে পড়িয়াছিল, এখন আমাদিগকে সহরভুক্ত করিবার প্রস্তাব আসিয়াছে। ইহা আমি গোপনে সংবাদ পাইয়াছি। এখন আমরা মানবসমাজ নামক বৃহৎ মিউনিসিপালিটির জন্য ট্যাক্স দিবার অধিকারী হইয়াছি। আমরা পৃথিবীর রাজধানীভুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা রাজধানীকে কর দিব এবং রাজধানীর কর আদায় করিব।

মানুষের জন্য কাজ না করিলে মানুষের মধ্যে গণ্য হওয়া যায় না। একদেশবাসীর মধ্যে যেখানে প্রত্যেকেই সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ, সকলের দায় সকলেই নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করে সেখানেই প্রকৃতরূপে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে। আর যাঁহারা স্বজাতিকে অতিক্রম করিয়া মানবসাধারণের জন্য কাজ করেন তাঁহারা মানবজাতির মধ্যে গণ্য। আমরা স্বজাতি ও মানবজাতির জন্য কাজ করিতে পারিব বলিয়া কি আশ্বাস জন্মিতেছে না? আমাদের মধ্যে এক বৃহৎ ভাবের বন্যা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমাদিগকে সর্ব্বসাধারণের সহিত একাকার করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকে বিলাপ করিতেছে, "সমস্ত 'একাকার' হইয়া গেল" কিন্তু আমার মনে আজ এই বলিয়া আনন্দ হইতেছে যে, আজ সমস্ত 'একাকার' হইবারই উপক্রম হইয়াছে বটে। আমরা যখন বাঙালী হইব তখন একবার 'একাকার' হইবে, আর বাঙালী যখন মানুষ হইবে তখন আরও 'একাকার' হইবে। বিপুল মানবশক্তি বাংলা-সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে ইহা আমি দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি। ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে কে পারে?

এ আমাদের সঙ্কীর্ণতা আমাদের আলস্য ঘুচাইয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের মধ্যে বৃহৎ প্রাণ সঞ্চার করিয়া সেই প্রাণ পৃথিবীর সহিত যোগ করিয়া দিবে। আমাদিগকে তাহার দূত করিয়া পৃথিবীতে নূতন নূতন সংবাদ প্রেরণ করিবে। আমাদের দ্বারা তাহার কাজ করাইয়া লইয়া তবে নিস্তার! আমার মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, বাঙালীদের একটা কাজ আছেই। আমরা নিতান্ত পৃথিবীর অন্নধ্বংস করিতে আসি নাই। আমাদের লজ্জা একদিন দূর হইবে। ইহা আমরা হৃদয়ের ভিতর হইতে অনুভব করিতেছি।

আমাদের আশ্বাসের কারণও আছে। আমাদের বাঙালীর মধ্য হইতেই ত চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি ত বিঘাকাঠার মধ্যেই বাস করিতেন না, তিনি ত সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানব-প্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন ত বাংলা পৃথিবীর এক প্রান্তভাগে ছিল, তখন ত সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলোর সৃষ্টি হয় নাই; সকলেই আপনাপন আহ্নিক তর্পণ ও চণ্ডীমণ্ডপটি লইয়া ছিল—তখন এমন কথা কি করিয়া বাহির হইল—

"মার খেয়েছি না হয় আরো খাব,
তাই বলে কি প্রেম দিব না? আয়!"

একথা ব্যাপ্ত হইল কি করিয়া? সকলের মুখ দিয়া বাহির হইল কি করিয়া? আপনাপন বাঁশবাগানের পর্শ্বস্থ ভদ্রাসনবাটির মনসাসিজের বেড়া ডিঙ্গাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল, এবং সে আহ্বানে সকলে সাড়া দিল কি করিয়া? এক দিন ত বাংলা দেশে ইহাও সম্ভব হইয়াছিল? একজন বাঙালী আসিয়া একদিন বাঙালা দেশকে ত পথে বাহির করিয়াছিল? একজন বাঙালী ত এক-দিন সমস্ত পৃথিবীকে পাগল করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং

বাঙালীরা সেই ষড়যন্ত্রে ত যোগ দিয়াছিল! বাঙালার সে এক গৌরবের দিন। তখন বাঙালা স্বাধীনই থাকুক আর অধীনই থাকুক, মুসলমান নবাবের হাতেই থাকুক আর স্বদেশীয় রাজার হাতেই থাকুক, তাহার পক্ষে সে একই কথা। সে আপন তেজে আপনি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

আসল কথা বাংলায় সেই এক দিন সমস্ত একাকার হইবার যো হইয়াছিল। তাই কতকগুলো লোক খেপিয়া চৈতন্যকে কলসীর কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। কলসীর কানা ভাসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না। তখন ত আর্য্যকুলতিলকেরা জাতিভেদ লইয়া তর্ক তুলে নাই। আমি ত বলি তর্ক করিলেই তর্ক উঠে। বৃহৎ ভাব যখন অগ্রসর হইতে থাকে তখন তর্ক বিতর্ক খুঁটিনাটি সমস্তই অচিরাৎ আপনাপন গর্ত্তের মধ্যে সুড়্ সুড়্ করিয়া প্রবেশ করে। কারণ মরার বাড়া আর গাল নাই। বৃহৎ ভাব আসিয়া বলে, সুবিধা অসুবিধার কথা হইতেছে না আমার জন্য সকলকে মরিতে হইবে। লোকেও তাহার আদেশ শুনিয়া মরিতে বসে। মরিবার সময় খুঁটিনাটি লইয়া তর্ক করে কে বল!

চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলা দেশের গানের সুর পর্য্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এক-কণ্ঠ-বিহারী বৈঠকী সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল? তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ হিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগ রাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্ত্তন বলিয়া এক নূতন কীর্ত্তন উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর—অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দনধ্বনি! বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া

বিনাইয়া একটিমাত্র বিরহিণীর বৈঠকি কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্বজগতের ক্রন্দনধ্বনি।

তাই আশা হইতেছে, আর একদিন হয় ত আমরা একই মত্ততায় পাগল হইয়া সহসা একজাতি হইয়া উঠিতে পারিব। বৈঠকখানার আস্‌বাব ছাড়িয়া সকলে মিলিয়া রাজপথে বাহির হইতে পারিব। বৈঠকি ধ্রুপদ খেয়াল ছাড়িয়া রাজপথী কীর্ত্তন গাহিতে পারিব। মনে হইতেছে এখনি বঙ্গদেশের প্রাণের মধ্যে একটি বৃহৎ কথা প্রবেশ করিয়াছে, একটি আশ্বাসের গান ধ্বনিত হইতেছে, তাই সমস্ত দেশটা মাঝে মাঝে টল্‌মল্‌ করিয়া উঠিতেছে। এ যখন জাগিয়া উঠিবে তখন আজিকার দিনের এই সকল সংবাদপত্রের মেকি সংগ্রাম, শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তর্ক বিতর্ক ঝগড়াঝাটি সমস্ত চুলায় যাইবে, আজিকার দিনের বড় বড় ছোটলোকদিগের নখে আঁকা গণ্ডীগুলি কোথায় মিলাইয়া যাইবে! সেই আর একদিন বাংলা একাকার হইবে!

প্রকৃত স্বাধীনতা ভাবের স্বাধীনতা। বৃহৎ ভাবের দাস হইলেই আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ ও গৌরব অনুভব করিতে পারি। তখন কেই বা রাজা কেই বা মন্ত্রী! তখন একটা উঁচু সিংহাসনমাত্র গড়িয়া আমাদের চেয়ে কেহ উঁচু হইতে পারে না। সেই গৌরব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের সহস্র বৎসরের অপমান দূর হইয়া যাইবে, আমরা সকল বিষয়ে স্বাধীন হইবার যোগ্য হইব।

আমাদের সাহিত্য যদি পৃথিবীর সাহিত্য হয়, আমাদের কথা যদি পৃথিবীর কাজে লাগে, এবং সে-সূত্রেও যদি বাংলার অধিবাসীরা পৃথিবীর অধিবাসী হইতে পারে—তাহা হইলেও আমাদের মধ্যে গৌরব জন্মিবে—হীনতা ধূলার মত আমরা গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিব।

কেবলমাত্র বন্দুক ছুঁড়িতে পারিলেই যে আমরা বড়লোক হইব তাহা নহে, পৃথিবীর কাজ করিতে পারিলে তবে আমরা বড়লোক হইব।

আমার ত আশা হইতেছে আমাদের মধ্যে এমন সকল বড়লোক জন্মিবেন যাঁহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের সামিল করিবেন ও এইরূপে পৃথিবীর সীমানা বাড়াইয়া দিবেন।

তুমি নাকি বড় চিঠি পড় না তাই ভয় হইতেছে পাছে এই চিঠি ফেরৎ দিয়া ইহার সংক্ষেপ মর্ম্ম লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ কর। কিন্তু তুমি পড় আর নাই পড় আমি লিখিয়া আনন্দলাভ করিলাম। এ যেন আমিই আমাকে চিঠি লিখিলাম, এবং পড়িয়া সম্পূর্ণ পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম।

সেবক

শ্রীনবীনকিশোর শর্ম্মণঃ।

(৭)

চিরঞ্জীবেষু—

ভায়া! আমাদের সেকালে পোষ্টাফিসের বাহুল্য ছিল না—জরুরি কাজের চিঠি ছাড়া অন্য কোনো প্রকার চিঠি হাতে আসিত না, এই জন্য সংক্ষেপ চিঠি পড়াই আমাদের অভ্যাস। তা ছাড়া বুড়ামানুষ প্রত্যেক অক্ষর বানান করিয়া করিয়া পড়িতে হয়; বড় চিঠি পড়িতে ডরাই—সে-কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তোমার চিঠি পড়িয়া দীর্ঘ পত্র পড়ার দুঃখ আমার সমস্ত দূর হইল। তুমি যে হৃদয়পূর্ণ চিঠি লিখিয়াছ, তাহার সমালোচনা করিতে বসিতে আমার মন সরিতেছে না; কিন্তু বুড়া মানুষের কাজই সমালোচনা করা। যৌবনের সহজ চক্ষুতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যগুলিই দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু চষ্‌মার ভিতর দিয়া কেবল অনেকগুলা খুঁৎ এবং খুঁটিনাটি চোখে পড়ে।

বিদেশে গিয়া যে, বাঙালী জাতির উন্নতি-আশা তোমার মনে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তাহার গুটিকতক কারণ আছে। প্রধান কারণ— এখানে তোমার অজীর্ণ রোগ ছিল, সেখানে তোমার খাদ্য জীর্ণ হইতেছে, এবং সেই সঙ্গে ধরিয়া লইতেছ যে, বাঙালী মাত্রেরই পেটে অন্ন পরিপাক পাইতেছে—এরূপ অবস্থায় কাহার না আশার সঞ্চার হয়? কিন্তু আমি অম্লশূল পীড়ায় কাতর বাঙালীসন্তান—তোমার চিঠিটা আমার কাছে আগাগোড়াই কাহিনী বলিয়া ঠেকিতেছে। পেটে আহার জীর্ণ হওয়া এবং না হওয়াব উপর পৃথিবীর কত সুখ দুঃখ মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে না। পাকযন্ত্রের উপর যে-উন্নতির ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই সে-উন্নতি ক'দিন টিঁকিতে পারে! জঠরানলের প্রখর প্রভাবই মনুষ্যজাতিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। যে জাতির ক্ষুধা কম, সে জাতি থাকিলেও হয় গেলেও হয় তাহার দ্বারা কোনো কাজ হইবে না। যে জাতি আহার করে অথচ হজম করে না, সে-জাতি কখনই সদ্গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না।

বাঙালী জাতিব অম্লরোগ হইল বলিয়া বাঙালী কেরাণীগিরি ছাড়িতে পারিল না। তাহার সাহস হয় না, আশা হয় না, উদ্যম হয় না। এ-জন্য বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের শরীর অপটু, বুদ্ধি অপরিপক্ক, উদরাম্ল ততোধিক। অতএব সমাজসংস্কারের ন্যায় পাকযন্ত্রসংস্কারও আমাদের আবশ্যক হইয়াছে।

আনন্দ না থাকিলে উন্নতি হইবে কি করিয়া! আশা উৎসাহ সঞ্চয় করিব কোথা হইতে! অকৃতকার্য্যকে সিদ্ধির পথে বার বার অগ্রসর করিয়া দিবে কে! আমাদের এই নিরানন্দের দেশে উঠিতে ইচ্ছা করে না, কাজ করিতে ইচ্ছা করে না, একবার পড়িয়া গেলেই মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। প্রাণ না দিলে কোনো কাজ হয় না—কিন্তু প্রাণ দিব কিসের পরিবর্ত্তে! আমাদের প্রাণ কাড়িয়া লইবে কে!

আনন্দ নাই—আনন্দ নাই! দেশে আনন্দ নাই! জাতির হৃদয়ে আনন্দ নাই! কেমন করিয়া থাকিবে? আমাদের এই স্বল্পায়ু ক্ষুদ্র শীর্ণ দেহ, অম্লশূলে বিদ্ধ, ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ—রোগের অবধি নাই—বিশ্বব্যাপিনী আনন্দ সুধার অনন্ত প্রস্রবণধারা আমরা যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না—এই জন্য নিদ্রা আর ভাঙ্গে না, একবার শ্রান্ত হইয়া পড়িলে শ্রান্তি আর দূর হয় না—একবার কার্য্য ভাঙিয়া গেলে কার্য্য আর গঠিত হয় না—একবার অবসাদ উপস্থিত হইলে তাহা ক্রমাগতই ঘনীভূত হইতে থাকে।

অতএব কেবল মাতিয়া উঠিলেই হইবে না, সেই মত্ততা ধারণ করিয়া রাখিবার, সেই মত্ততা সমস্ত জাতির শিরার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার ক্ষমতা সঞ্চয় করা চাই। একটি স্থায়ী আনন্দের ভাব সমস্ত জাতির হৃদয়ে দৃঢ় বদ্ধমূল হওয়া চাই। এমন এক প্রবল উত্তেজনাশক্তি আমাদের জাতি হৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে অহরহ দণ্ডায়মান থাকে যাহার আনন্দ-উচ্ছ্বাস বেগে আমাদের জীবনের প্রবাহ সহস্র ধারায় জগতের সহস্র দিকে প্রবাহিত হইতে পারে। কোথায় বা সে শক্তি! কোথায় বা তাহার দাঁড়াইবার স্থান! সে শক্তির পদভারে আমাদের এই জীর্ণ দেহ বিদীর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

আমি ত ভাই ভাবিয়া রাখিয়াছি, যে দেশের আব্‌হাওয়ায় বেশী মশা জন্মায় সেখানে বড় জাতি জন্মিতে পারে না। এই আমাদের জলা জমি জঙ্গল এই কোমল মৃত্তিকার মধ্যে কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর প্রবল সভ্যতার স্রোত আসিয়া আমাদের কাননবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন নিভৃত ক্ষুদ্র কুটীরগুলি কেবল ভাঙিয়া দিতেছে মাত্র। আকাঙ্ক্ষা আনিয়া দিতেছে কিন্তু উপায় নাই—কাজ বাড়াইয়া দিতেছে কিন্তু শরীর নাই—অসন্তোষ আনিয়া দিতেছে কিন্তু উদ্যম নাই। আমাদের যে স্বস্তি ছিল তাহা ভাসাইয়া দিতেছে—তাহার পরিবর্ত্তে যে সুখের মরীচিকা রচনা

করিতেছে তাহাও আমাদের দুষ্প্রাপ্য। কাজ করিয়া প্রকৃত সিদ্ধি নাই কেবল অহর্নিশি শ্রান্তিই সার। আমার মনে হয় তার চেয়ে আমরা ছিলাম ভাল—আমাদের সেই স্নিগ্ধ কাননচ্ছায়ায়, পল্লবের মর্ম্মর শব্দে, নদীর কলস্বরে, সুখের কুটীরে স্নেহশীল পিতামাতা, পতিপ্রাণা স্ত্রী, স্বজন-বৎসল পুত্রকন্যা, পরিবারপ্রতিম পরিচিত প্রতিবেশীদিগকে লইয়া যে নিরুপদ্রব নীড়টুকু রচনা করিয়াছিলাম, সে ছিলাম ভাল। য়ুরোপীয় বিরাট সভ্যতার পাষাণ-উপকরণসকল আমরা কোথায় পাইব! কোথায় সে বিপুল বল, সে শ্রান্তিমোচন জলবায়ু, সে ধুরন্ধর প্রশস্ত ললাট! অবিশ্রাম কর্ম্মানুষ্ঠান—বাধাবিঘ্নের সহিত অবিশ্রাম যুদ্ধ—নূতন নূতন পথের অনুসন্ধানে অবিশ্রাম ধাবন—অসন্তোষানলে অবিশ্রাম দাহন— সে আমাদের এই প্রখর রৌদ্রতপ্ত আর্দ্রসিক্ত দেশে জীর্ণশীর্ণ দুর্ব্বল-দেহে পারিব কেন? কেবল আমাদের শ্যামল শীতল তৃণনিবাস পরিত্যাগ করিয়া আমরা পতঙ্গের মত উগ্র সভ্যতানলে দগ্ধ হইয়া মরিব মাত্র।

বালকেরা শুনিবে এবং বৃদ্ধেরা বলিবে এই জন্য তোমাদের কাছে সংক্ষেপ-চিঠি প্রত্যাশা করি কিন্তু নিজে বড় চিঠি লিখি। অর্ব্বাচীনদের কথা ধৈর্য্য ধরিয়া বেশিক্ষণ শুনিতে পারি না—কিন্তু নিজের কথা বলিয়া তৃপ্তি হয় না—অতএব "নিজে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর অন্যের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিবে" এই উপদেশ অনুসারে আমার সহিত কাজ করিয়ো না—আগে হইতে সতর্ক করিয়া দিলাম।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্ম্মণঃ ৮

(৮)

শ্রীচরণেষু—

তবে আর কি! তবে সমস্ত চুলায় যাক্। বাংলাদেশ তাহার আম কাঁঠালের বাগান এবং বাঁশঝাড়ের মধ্যে বসিয়া কেবল ঘরকন্না করিতে থাকুক্। স্কুল উঠাইয়া দাও, সাপ্তাহিক এবং মাসিক সমুদয় কাগজপত্র বন্ধ কর, পৃথিবীর সকল বিষয় লইয়াই যে আন্দোলন আলোচনা পড়িয়া গিয়াছে সেটা বলপূর্ব্বক স্থগিত কর, ইংরাজী পড়া একেবারেই বন্ধ কর, বিজ্ঞান শিখিয়ো না, যে-সমস্ত মহাত্মা মানবজাতির জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের ইতিহাস পড়িয়ো না, পৃথিবীর যে-সকল মহৎ অনুষ্ঠান বাসুকির ন্যায় সহস্র শিরে মানবজাতিকে বিনাশ বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিয়া অটল উন্নতির পথে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া থাক। অর্থাৎ যাহাতে করিয়া হৃদয় জাগ্রত হয়, মনে উদ্যমের সঞ্চার হয়, বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়া একত্রে কাজ করিবার জন্য অনিবার্য্য আবেগ উপস্থিত হয়—সে-সমস্ত হইতে দূরে থাক। পড়িবার মধ্যে নূতন পঞ্জিকা পড়, কোন্ দিন বার্ত্তাকু নিষেধ ও কোন্ দিন কুষ্মাণ্ড বিধি তাহা লইয়া প্রতিদিন সমালোচনা কর। দালান, ডাবাহুঁকা, নস্য ও নিন্দা লইয়া এই রৌদ্র-তাপদগ্ধ নিদাঘ-মধ্যাহ্ন অতিবাহিত কর। সন্তানদের মাথার মধ্যে চাণক্যের শ্লোক প্রবেশ করাইয়া সেই মাথাগুলো ইহকাল ও পরকালের মত ভক্ষণের যোগাড় করিয়া রাখ।

দাদা মহাশয়, তুমি কি সত্য সত্যই বলিতেছ, আমরা একশত বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম, অবিকল সেইরূপ থাকাই ভাল, আর কিছু-মাত্র উন্নতি হইয়া কাজ নাই। জ্ঞান লাভ করিয়া কাজ নাই, পাছে প্রবল জ্ঞানলালসা জন্মিয়া আমাদের দুর্ব্বল দেহকে জীর্ণ করিয়া ফেলে! লোকহিতপ্রবর্ত্তক উন্নত উপদেশ শুনিয়া কাজ নাই পাছে মানব-

হিতের জন্য কঠোর ব্রত পালন করিতে গিয়া এই প্রখর রৌদ্রতাপে আমরা শুষ্ক হইয়া যাই। বড়লোকের জীবনবৃত্তান্ত পড়িয়া কাজ নাই, পাছে এই মশকের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে বড়লোক হইবাব দুরাশা জাগ্রত হয়! তুমি পরামর্শ দিতেছ ঠাণ্ডা হও, ছায়ায় থাক, গৃহের দ্বার রুদ্ধ কর, ডাবের জল খাও, নাসারন্ধ্রে তৈল দাও, এবং স্ত্রী পুত্র পরিবার ও প্রতিবেশীদিগকে লইয়া নিরুপদ্রবে সুখনিদ্রার আয়োজন কর।

কিন্তু এখন পরামর্শ দেওয়া বৃথা—সাবধান করা নিষ্ফল। বাঁশির ধ্বনি কানে আসিয়াছে, আমরা গৃহের বাহির হইব। যে বন্ধনে আমরা সমস্ত মানবজাতির সহিত যুক্ত, সেই বন্ধনে আজ টান পড়িয়াছে। বৃহৎ মানব আমাদিগকে ডাকিয়াছে, তাহার সেবা করিতে না পারিলে আমাদের জীবন নিষ্ফল। আমাদের পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র্য, বাৎসল্য, দাম্পত্যপ্রেম সমস্ত সে চাহিতেছে, তাহাকে যদি বঞ্চিত করি তবে আমাদের সমস্ত প্রেম ব্যর্থ হয়, আমাদের হৃদয় অপরিতৃপ্ত থাকে। যেমন বালিকা স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে যতই স্বামী-প্রেমের মর্ম্ম অবগত হইতে থাকে, ততই তাহার হৃদয়ের সমুদয় প্রবৃত্তি স্বামীর অভিমুখিনী হইতে থাকে, তখন শরীরের কষ্ট, জীবনের ভয়, বা কোনো উপদেশই তাহাকে স্বামীসেবা হইতে ফিরাইতে পারে না, তেমনি আমরা মানব-প্রেমের মর্ম্ম অবগত হইতেছি এখন আমরা মানব-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিব, কোনো দাদা মশায়ের কোনো উপদেশ তাহা হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। মরণ হয় ত মরিব, কোনো উপায় নাই। কি সুখেই বা বাঁচিয়া আছি!

আনন্দের কথা বলিতেছ? এই ত আনন্দ! এই নূতন জ্ঞান, এই নূতন প্রেম, এই নূতন জীবন—এই ত আনন্দ! আনন্দের লক্ষণ কি কিছু ব্যক্ত হইতেছে না, জাগরণের ভাব কি কিছু প্রকাশ পাইতেছে

না! বঙ্গসমাজের গঙ্গায় একটা জোয়ার আসিতেছে বলিয়া কি মনে হইতেছে না! তাই কি সমাজের সর্ব্বাঙ্গ আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠে নাই! আমাদের এদেশ নিরানন্দের দেশ, আমাদের এদেশে রোগ শোক তাপ আছে, রোগ শোকে নিরানন্দে আমরা জীর্ণ হইয়া মরিতে বসিয়াছি—সেই জন্যই আমরা আনন্দ চাই, জীবন চাই—সেই জন্যই বলিতেছি নূতন স্রোত আসিয়া আমাদের মুমূর্ষু হৃদয়ের স্বাস্থ্যবিধান করুক্—মরিতেই যদি হয় ত যেন আনন্দের প্রভাবেই মরিতে পারি!

আর, মরিব কেন! তুমি এমনি কি হিসাব জান যে, একবারে ঠিক দিয়া রাখিয়াছ যে, আমরা মরিতেই বসিয়াছি! তোমার বুড়ো-মানুষের হিসাব অনুযায়ী মনুষ্যসমাজ চলে না। তুমি কি জান, মানুষ সহসা কোথা হইতে বল পায়, কোথা হইতে দৈবশক্তি লাভ করে? মনুষ্য-সমাজ সাধারণতঃ হিসাবে চলে বটে, কিন্তু এক এক সময়ে সেখানে যেন ভেল্কী লাগিয়া যায় তখন আর হিসাবে মেলে না। অন্য সময়ে দুয়ে দুয়ে চার হয়, সহসা এক দিন দুয়ে দুয়ে পাঁচ হইয়া যায়, তখন বুড়োমানুষেরা চক্ষু হইতে চষমা খুলিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে। সহসা যখন নূতন ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইয়া জাতির হৃদয়ে আবর্ত্ত রচনা করে তখনই সেই ভেল্কী লাগিবার সময়—তখন যে কি হইতে কি হয় ঠাহর পাইবার যো নাই। অতএব আঁব বাগানে আমাদের সেই ক্ষুদ্র নীড়ের মধ্যে আর ফিরিব না।

হয় মরিব নয় বাঁচিব, এই কথাই ভাল। মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই। ক্রমোয়েল যখন ইংলণ্ডের দাসত্ব-রজ্জু ছেদন করিতেছিলেন তখন তিনি মরিতেও পারিতেন, বাঁচিতেও পারিতেন, ওয়াসিংটন্ যখন আমেরিকায় স্বাধীনতার ধ্বজা উঠাইয়াছিলেন তখন তিনি মরিতেও পারিতেন বাঁচিতেও পারিতেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এমন

কেহ মরে কেহ বাঁচে—তাহাতে আপত্তি কি ? নিরুদ্যমই প্রকৃত মৃত্যু। আমরা, না হয় বাঁচিব, না হয় মরিব—তাই বলিয়া কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া দাদা মশায়ের কোলের কাছে বসিয়া সমস্ত দিন উপকথা শুনিতে পারিব না। তোমার কি ভয় হয় পাছে তোমার বংশে বাতি দিবার কেহ না থাকে! জিজ্ঞাসা করি, এখনই বা কে বাতি দিতেছে? সমস্তই যে অন্ধকার!

বিদায় লইলাম দাদা মহাশয়! আমাদের আর চিঠিপত্র চলিবে না। আমাদের কাজ করিবার বয়স। সংসারে কাজের বাধা যথেষ্ট আছে—পদে পদে বিঘ্নবিপত্তি, তাহার পরে বুড়োমানুষদের কাছ হইতে যদি নৈরাশ্য সঞ্চয় করিতে হয় তাহা হইলে যৌবন ফুরাইবার আগেই বৃদ্ধ হইতে হইবে। তাহা হইলে পঞ্চাশে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অরণ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। সম্মুখে আমাকে আহ্বান করিতেছে, আমি তোমার দিকে ফিরিয়া চাহিব না। তুমি বলিতেছ পথের মধ্যে খানা আছে ডোবা আছে সেইখানে পড়িয়া তুমি ঘাড় ভাঙিয়া মরিবে, অতএব ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া থাকাই ভাল—আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। আমি দুর্ব্বল সত্য, কিন্তু তোমার উপদেশে আমি ত বল পাইতেছি না, আমার ব্রতপালনের পক্ষে আমি হীন বুদ্ধি বটে, কিন্তু তোমার উপদেশে আমি ত বুদ্ধি পাইতেছি না, অতএব আমার যেটুকু বল যেটুকু বুদ্ধি আছে, তাহাই সহায় করিয়া চলিলাম, মরিতে হয় ত চিরজীবনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া মরিব।

সেবক

শ্রীনবীনকিশোর শর্ম্মণঃ।

---

(৯)

চিরঞ্জীবেষু—

ভায়া, তোমার চিঠিতে কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতে আমি দুঃখিত নই। তোমাদের রক্তের তেজ আছে; মাঝে মাঝে তোমরা যে গরম হইয়া উঠ, ইহা দেখিয়া আমাদের আনন্দ বোধ হয়। আমাদের মত শীতল রক্ত যদি তোমাদের হইত তাহা হইলে পৃথিবীর কাজ চলিত কি করিয়া? তাহা হইলে ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র মেরুপ্রদেশে পরিণত হইত।

অনেক বুড়ো আছে বটে, তাহারা পৃথিবী হইতে যৌবন লোপ করিতে চায়, তাহাদের নিজ হৃদয়ের শৈত্য সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত হয় এই তাহাদের ইচ্ছা। যেখানে একটু মাত্র তাত পাওয়া যায়, সেইখানেই তাহারা অত্যন্ত ঠাণ্ডা ফুঁ দিয়া সমস্ত জুড়াইয়া হিম করিয়া দিতে চাহে। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে কাঁচা চুল আগাগোড়া উৎপাটন করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা পাকা চুল বুনানি করিতে চায়। তাহারা যে এক-কালে যুবা ছিল তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যায়, এই জন্য যৌবন তাহাদের নিকটে একেবারে দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে। যৌবনের গান শুনিয়া তাহারা কাণে আঙুল দেয়, যৌবনের কাজ দেখিয়া তাহারা মনে করে পৃথিবীতে কলিযুগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। শ্যামল কিশলয়ের অসম্পূর্ণতা দেখিয়া ধূলাশায়ী জীর্ণ পত্র যেমন অত্যন্ত শুষ্ক পীত হাস্য হাসিতে থাকে, অপরিণত যৌবনের সরস শ্যামলতা দেখিয়া অনেক বৃদ্ধ তেম্‌নি করিয়া হাসিয়া থাকে। এই জন্যই ছেলে বুড়োর মাঝখানে এত দৃঢ় ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে।

আমার কি ভাই সাধ যে, কেবল কতকগুলো উপদেশের ধোঁয়া দিয়া তোমাদের কাঁচা মাথা একদিনে পাকাইয়া তুলি! কাজ করিতে যদি পারিতাম তা হইলে কি আর সমালোচনা করিতে বসিতাম!

তোমরা যুবা, তোমাদের কত সুখ আছে বল দেখি ; আমাদের উদ্যমের সুখ নাই, কর্ম্মানুষ্ঠানের সুখ নাই, একমাত্র বকুনির সুখ আছে, তাহাও সম্মুখের দন্তাভাবে ভালরূপে সমাধা হয় না, ইহাতেও তোমরা চটিলে চলিবে কেন ?

কাজ নাই ভাই, আমার সংশয় আমার বিজ্ঞতা আমার কাছেই থাক্, তোমরা নিঃসংশয়ে কাজ কর, নির্ভয়ে অগ্রসর হও। নূতন নূতন জ্ঞানের অনুসন্ধান কর, সত্যের জন্য সংগ্রাম কর, জগতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ কর। যে স্রোতে পড়িয়াছ, এই স্রোতকেই অবলম্বন করিয়া উন্নতি-তীর্থের দিকে ধাবমান হও, নিমগ্ন হইলে লজ্জার কারণ নাই, উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তোমাদের জন্মলাভ সার্থক হইবে, তোমাদের দুঃখিনী জন্মভূমি ধন্য হইবে।

আমি যে চিরজীবন কাটাইয়া অবশেষে যাবার মুখে তোমাদের দু'টো একটা কথা বলিয়া যাইতেছি, তাহা শুনিলে যে তোমাদের উপকার হইবে না, একথা আমাব বিশ্বাস হয় না। তাহার সকল কথাই যে বেদবাক্য তাহা নহে, কিম্বা তাহার সকল কথাই যে এখনকার দিনে খাটিবে তাহাও নহে, কিন্তু ইহা নিঃসংশয় যে তাহাতে কিছু না কিছু সত্য আছেই, আমার এই সুদীর্ঘ জীবন কিছু সমস্ত ব্যর্থ, সমস্ত মিথ্যা নহে ; এই সংশয়াচ্ছন্ন সংসারে আমার দীর্ঘ জীবন যে, সত্য পথ-নির্দ্দেশের কিছুমাত্র সহায়তা করিবে না তাহা আমার মন বলিতে চায় না। এই জন্য, আমি কোনো দৃঢ় অনুশাসন প্রচার করিতে চাই না, আমি বলিতে চাই না আমার সমস্ত কথা আগাগোড়া পালন না করিলে তোমরা উৎসন্ন যাইবে, আমি কেবল এই বলিতে চাই আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুন, একবারে কানে আঙুল দিয়ো না, তার পরে বিচার কর, বিবেচনা কর, যাহা ভাল বোধ হয় তাহা গ্রহণ কর। সম্মুখের

দিকে অগ্রসর হও কিন্তু পশ্চাতের সহিত বিবাদ করিয়ো না। এক প্রেমের সূত্রে অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে বাঁধিয়া রাখ।

আমার ত ভাই যাবার সময় হইয়াছে। "যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনামাবিষ্কৃতারুণ পুরঃসর একতোঽর্কঃ।" আমরা সেই অস্তগামী চন্দ্র, আমরা রজনীতে বঙ্গভূমির নিদ্রিতাবস্থায় বিরাজ করিতে-ছিলাম; তখন যে একটি সুগভীর শান্তি ও সুস্নিগ্ধ মাধুর্য্য ছিল তাহা অস্বীকার করিবার কথা নহে, কিন্তু তাই বলিয়া আজ এই যে কর্ম্ম কোলাহল জাগাইয়া অরুণোদয় হইতেছে, ইহাকে সাদর সম্ভাষণ না করিব কেন? কেন বলিব তীক্ষ্ণপ্রভ দিবসের প্রয়োজন নাই, রজনীর পরে রজনী ফিরিয়া আসুক? এস অরুণ, এস, তুমি আকাশ অধিকার কর, আমি নীরবে তোমাকে পথ ছাড়িয়া দিই। আমি তোমার দিকে চাহিয়া ক্ষীণহাস্যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করি। আমার নিদ্রা, আমার শান্ত নীরবতা, আমার স্নিগ্ধ হিমসিক্ত রজনী আমার সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হইয়া থাকে, তোমারই সমুজ্জ্বল মহিমা জীবন বিতরণ করিয়া জলে স্থলে চরাচরে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্ম্মণঃ।

১২৯২।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম

ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস?

একদিন যে শ্বেতকায় আর্য্যগণ প্রকৃতির এবং মানুষের সমস্ত দুরূহ বাধা ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন; যে অন্ধকারময় সুবিস্তীর্ণ অরণ্য এই বৃহৎ দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রসারিত ছিল তাহাকে একটা নিবিড় যবনিকার মত সরাইয়া দিয়া ফলশস্যে বিচিত্র, আলোকময়, উন্মুক্ত রঙ্গভূমি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি, শক্তি ও সাধনা একদিন এই ইতিহাসের ভিত্তিরচনা করিয়াছিল। কিন্তু একথা তাঁহারা বলিতে পারেন নাই যে, ভারতবর্ষ আমাদেরই ভারতবর্ষ।

আর্য্যরা অনার্য্যদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম যুগে আর্য্যদের প্রভাব যখন অক্ষুণ্ণ ছিল তখনো অনার্য্য শূদ্রদের সহিত তাঁহাদের প্রতিলোম বিবাহ চলিতেছিল। তারপর বৌদ্ধযুগে এই মিশ্রণ আরো অবাধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগের অবসানে যখন হিন্দুসমাজ আপনার বেড়াগুলি পুনঃসংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং খুব শক্ত পাথর দিয়া আপন প্রাচীর পাকা করিয়া গাঁথিতে চাহিল, তখন দেশের অনেক স্থলে এমন অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, ক্রিয়াকর্ম্ম পালন করিবার জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়াছিল; অনেক স্থলে ভিন্নদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে রাজাজ্ঞায় উপবীত পরাইয়া ব্রাহ্মণ রচনা করিতে হইয়াছে একথা প্রসিদ্ধ। বর্ণের যে শুভ্রতা লইয়া একদিন আর্য্যরা গৌরব বোধ করিয়াছিলেন সে শুভ্রতা মলিন হইয়াছে; এবং আর্য্যগণ শূদ্রদের সহিত

মিশ্রিত হইয়া, তাহাদের বিবিধ আচার ও ধর্ম্ম, দেবতা ও পূজাপ্রণালী গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগকে সমাজের অন্তর্গত করিয়া লইয়া হিন্দুসমাজ বলিয়া এক সমাজ রচিত হইয়াছে; বৈদিক সমাজের সহিত কেবল যে তাহার ঐক্য নাই তাহা নহে অনেক বিরোধও আছে।

অতীতের সেই পর্ব্বেই কি ভারতবর্ষের ইতিহাস দাঁড়ি টানিতে পারিয়াছে? বিধাতা কি তাহাকে একথা বলিতে দিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস? হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বীরত্বের আত্ম-ঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এদেশে প্রবেশ করিল, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এদেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।

যদি এইখানেই ছেদ দিয়া বলি, বাস্, আর নয়—ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমরা হিন্দুমুসলমানেরই ইতিহাস করিয়া তুলিব, তবে যে-বিশ্বকর্ম্মা মানবসমাজকে সঙ্কীর্ণ কেন্দ্র হইতে ক্রমশই বৃহৎ পরিধির দিকে গড়িয়া তুলিতেছেন তিনি কি তাঁহার প্ল্যান বদলাইয়া আমাদেরই অহঙ্কারকে সার্থক করিয়া তুলিবেন?

ভারতবর্ষ আমার হইবে কি তোমার হইবে, হিন্দুর হইবে কি মুসলমানের হইবে, কি আর কোনো জাত আসিয়া এখানে আধিপত্য করিবে, বিধাতার দরবারে যে সেই কথাটাই সবচেয়ে বড় করিয়া আলোচিত হইতেছে তাহা নহে। তাঁহার আদালতে নানা পক্ষের উকীল নানা পক্ষের দরখাস্ত লইয়া লড়াই করিতেছে, অবশেষে একদিন মকদ্দমা শেষ হইলে পর হয় হিন্দু, নয় মুসলমান, নয় ইংরেজ, নয় আর কোনো জাতি চূড়ান্ত ডিক্রি পাইয়া নিশান গাড়ি করিয়া বসিবে একথা সত্য নহে। আমরা মনে করি জগতে স্বত্বের

লড়াই চলিতেছে, সেটা আমাদের অহঙ্কার; লড়াই যা সে সত্যের লড়াই।

যাহা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহা সকলের চেয়ে পূর্ণ, যাহা চরম সত্য, তাহা সকলকে লইয়া; এবং তাহাই নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিবার দিকে চলিয়াছে,—আমাদের সমস্ত ইচ্ছা দিয়া তাহাকেই আমরা যে পরিমাণে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিব সেই পরিমাণেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে; নিজেকেই ব্যক্তি হিসাবেই হউক্ আর জাতি হিসাবেই হউক্ জয়ী করিবার যে চেষ্টা, বিশ্ববিধানের মধ্যে তাহার গুরুত্ব কিছুই নাই। গ্রীসের জয়পতাকা আলেকজাণ্ডারকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে যে একচ্ছত্র করিতে পারে নাই তাহাতে গ্রীসের দম্ভই অকৃতার্থ হইয়াছে—পৃথিবীতে আজ সে দম্ভের মূল্য কি? রোমের বিশ্বসাম্রাজ্যের আয়োজন বর্ব্বরের সংঘাতে ফাটিয়া খান্ খান্ হইয়া সমস্ত য়ুরোপময় যে বিকীর্ণ হইল তাহাতে রোমকের অহঙ্কার অসম্পূর্ণ হইয়াছে কিন্তু সেই ক্ষতি লইয়া জগতে আজ কে বিলাপ করিবে? গ্রীস এবং রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহারা নিজেও সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্য্যন্ত যে বসিয়া নাই তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব করিয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।

ভারতবর্ষেও যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য্য এ নয় যে, এদেশে হিন্দুই বড় হইবে বা আর কেহ বড় হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে;—ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু, মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্ত্তমান বিশেষ

আকারটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।

আমরা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আছি। আমরা তাহার একটা উপকরণ। কিন্তু উপকরণ যদি এই বলিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ কবিতে থাকে যে আমরাই চরম, আমরা সমগ্রের সহিত মিলিব না, আমরা স্বতন্ত্র থাকিব, তবে সকল হিসাবেই ব্যর্থ হয়। বিরাট রচনার সহিত যে খণ্ড সামগ্রী কোনোমতেই মিশ খাইবে না, যে বলিবে আমিই টি`কিতে চাই, সে একদিন বাদ পড়িয়া যাইবে। যে বলিবে আমি স্বয়ং কিছুই নই, যে সমগ্র রচিত হইতেছে তাহারই উদ্দেশে আমি সম্পূর্ণভাবে উৎসৃষ্ট, ক্ষুদ্রকে সেই ত্যাগ করিয়া বৃহতের মধ্যে রক্ষিত হইবে। ভারতবর্ষেরও যে অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিবে না, যাহা কোনো একটা বিশেষ অতীত কালেব অন্তরালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অন্য সকলেব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনার চাবিদিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, ভারত ইতিহাসেব বিধাতা তাহাকে আঘাতের পর আঘাতে, হয় পরম দুঃখে সকলের সঙ্গে সমান করিয়া দিবেন নয় তাহাকে অনাবশ্যক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জ্জন করিবেন। কারণ, ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদেবই ইতিহাস নহে, আমরাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য সমাহৃত; আমরা নিজেকে যদি তাহার যোগ্য না করি তবে আমরাই নষ্ট হইব। আমরা সর্ব্বপ্রকারে সকলের সংস্রব বাঁচাইয়া অতি বিশুদ্ধভাবে স্বতন্ত্র থাকিব এই বলিয়া যদি গৌরব করি এবং যদি মনে করি এই গৌরবকেই আমাদের বংশপরম্পরায় চিরন্তন করিয়া রাখিবার ভার আমাদের ইতিহাস গ্রহণ করিয়াছে, যদি মনে করি আমাদের ধর্ম্ম কেবলমাত্র আমাদেরই, আমাদের আচার বিশেষভাবে আমাদেরই, আমাদের পূজাক্ষেত্রে আর

কেহ্ পদার্পণ করিবে না, আমাদের জ্ঞান কেবল আমাদেরই লৌহপেটকে আবদ্ধ থাকিবে তবে না জানিয়া আমরা এই কথাই বলি যে বিশ্বসমাজে আমাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়া আছে, এক্ষণে তাহারই জন্য আত্মরচিত কারাগারে অপেক্ষা করিতেছি।

সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহূত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। বিশ্বজগতে আমরা যাহা পাইতে পারি, তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেই আমাদের পিতামহেরা তাহা সমস্তই সঞ্চয় করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন, আমরা এমন হতভাগ্য নহি এবং জগৎ এত দরিদ্র নহে; আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা আমাদের পূর্ব্বেই করা হইয়া গেছে, একথা যদি সত্য হয়, তবে জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের প্রকাণ্ড অনাবশ্যকতা লইয়া আমরা ত পৃথিবীর ভার হইয়া থাকিতে পারিব না। যাহারা প্রপিতামহদের মধ্যেই নিজেকে সর্ব্বপ্রকারে সমাপ্ত বলিয়া জানে, এবং সমস্ত বিশ্বাস এবং আচারের দ্বারা আধুনিকের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে কোন বর্ত্তমানের তাড়নায়, কোন্ ভবিষ্যতের আশ্বাসে? পৃথিবীতে আমাদেরও যে প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজন আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বদ্ধ নহে, তাহা নিখিল মানুষের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের নানা পরিবর্দ্ধমান সম্বন্ধে, নানা উদ্ভাবনে, নানা প্রবর্ত্তনায় জাগ্রত থাকিবে ও জাগরিত করিবে, আমাদের মধ্যে সেই উদ্যম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্ঞেশ্বরের দূতের মত জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে

প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের আগমন যে-পর্য্যন্ত না সফল হইবে, জগৎ-যজ্ঞের নিমন্ত্রণে তাহাদের সঙ্গে যে-পর্য্যন্ত না যাত্রা করিতে পারিব, সে-পর্য্যন্ত তাহারা আমাদিগকে পীড়া দিবে, তাহারা আমাদিগকে আরামে নিদ্রা যাইতে দিবে না।

ইংরেজের আহ্বান যে-পর্য্যন্ত আমরা গ্রহণ না করিব, তাহাদের সঙ্গে মিলন যে-পর্য্যন্ত না সার্থক হইবে, সে-পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বিদায় করিব, এমন শক্তি আমাদের নাই। যে ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ—আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দূর কবিব, আমাদের এমন কি অধিকার আছে? বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা কে? এ-কি আমাদেরই ভারতবর্ষ? সেই আমরা কাহারা? সে কি বাঙালী, না মারাঠী, না পাঞ্জাবী; হিন্দু না মুসলমান? এক-দিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী—সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড "আমরার" মধ্যে যে-কেহই মিলিত হউক্, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ অথবা আরও যে-কেহ আসিয়াই এক হউক্ না—তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না থাকিবে।

ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে। মহা-ভারতবর্ষ গঠন ব্যাপারে এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে। বিমুখ হইব, বিচ্ছিন্ন হইব, কিছুই গ্রহণ করিব না, একথা বলিয়া আমরা কালের বিধানকে ঠেকাইতে পারিব না, ভারতের ইতিহাসকে দরিদ্র ও বঞ্চিত করিতে পারিব না।

অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড় মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবন-যাপন

করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্ব্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্ম্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন;—আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে; পৃথিবীর যে দেশেই যে-কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন তিনি আমাদেরই আপন, তাঁহাকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সঙ্কুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্য্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস কোনো ক্ষুদ্র অহঙ্কারবশত মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মত তিনি বিদ্রোহ করেন নাই; যে অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মত বহন করিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতে রাণাডে পূর্ব্ব পশ্চিমের সেতু-বন্ধনকার্য্যে জীবন যাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাঁধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে

দূর করে, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজনশক্তি, সেই মিলনতত্ত্ব, রাণাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল ; সেইজন্য ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যবহার-বিরোধ ও স্বার্থ-সংঘাত সত্ত্বেও তিনি সমস্ত সাময়িক ক্ষোভ ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছিলেন। ভারত ইতিহাসের যে উপকরণ ইংরেজের মধ্যে আছে, তাহা গ্রহণের পথ যাহাতে বিস্তৃত হয়, যাহাতে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণতা সাধনের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় ও উদার বুদ্ধি সেই চেষ্টায় চিরদিন প্রবৃত্ত ছিল।

অল্পদিন পূর্ব্বে বাংলা দেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব্বপশ্চিমের মিলন-যজ্ঞ আহ্বান করিলেন সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল, সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ, এ সাহিত্য সেই সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে, যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল

তাহার জন্যই যে তিনি বড় তাহা নহে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্ব্ব পশ্চিমের আদান প্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভাল করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

এমনি করিয়া আমরা যেদিক হইতে দেখিব, দেখিতে পাইব আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, যাঁহারা নবযুগ প্রবর্ত্তন করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের জীবনে বিরুদ্ধ ও পীড়িত হইবে না, পূর্ব্ব পশ্চিম তাঁহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে, ভারতবর্ষে আমরা নানাজাতি যে একত্রে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছি ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিকাল্ বল লাভ করা। এমনি করিয়া, যে জিনিষটা বড় তাহাকে আমরা ছোটর দাস করিয়া দেখিতেছি। ভারতবর্ষে আমরা সকল মানুষে মিলিব ইহা অন্য সকল উদ্দেশ্যের চেয়ে বড়, কারণ ইহা মনুষ্যত্ব। মিলিতে যে পারিতেছি না ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূলনীতি ক্ষুণ্ন হইতেছে, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার শক্তিই ক্ষীণ হইয়া সর্ব্বত্রই বাধা পাইতেছে; ইহা আমাদের পাপ, ইহাতে আমাদের ধর্ম্মনষ্ট হইতেছে বলিয়া সকলই নষ্ট হইতেছে।

সেই ধর্ম্মবুদ্ধি হইতে এই মিলন-চেষ্টাকে দেখিলে তবেই এই চেষ্টা সার্থক হইবে। কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি ত কোনো ক্ষুদ্র অহঙ্কার বা প্রয়োজনের মধ্যে বদ্ধ নহে। সেই বুদ্ধির অনুগত হইলে আমাদের মিলনচেষ্টা কেবল যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রজাতির মধ্যেই বদ্ধ হইবে তাহা নহে, এই চেষ্টা ইংরেজকেও ভারতবর্ষের করিয়া লইবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত হইবে।

সম্প্রতি ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষিত, এমন কি, অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও যে বিরোধ জন্মিয়াছে, তাহাকে আমরা কি ভাবে গ্রহণ করিব? তাহার মধ্যে কি কোনো সত্য নাই? কেবল তাহা কয়েকজন চক্রান্তকারীর ইন্দ্রজাল মাত্র? ভারতবর্ষের মহাক্ষেত্রে যে নানাজাতি ও নানাশক্তির সমাগম হইয়াছে, ইহাদের সংঘাতে সম্মিলনে যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে বর্ত্তমান বিরোধের আবর্ত্ত কি একেবারেই তাহার প্রতিকূল? এই বিরোধের তাৎপর্য্য কি তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বে বিরোধকেও মিলন সাধনার একটা অঙ্গ বলা হয়। লোকে প্রসিদ্ধি আছে যে, রাবণ ভগবানের শত্রুতা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, সত্যের নিকট পরাস্ত হইলে নিবিড়ভাবে সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সত্যকে অবিরোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না। এই জন্য সন্দেহ এবং প্রতিবাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে লড়াই করিয়া তবেই বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করে।

আমরা একদিন মুগ্ধভাবে জড়ভাবে য়ুরোপের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম; আমাদের বিচারবুদ্ধি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল; এমন করিয়া যথার্থভাবে লাভ করা যায় না। জ্ঞানই বল আর রাষ্ট্রীয় অধিকারই বল, তাহা উপার্জ্জনের অপেক্ষা রাখে—অর্থাৎ বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়া আত্মশক্তির দ্বারা লাভ করিলেই তবে তাহার উপলব্ধি ঘটে—কেহ তাহা আমাদের হাতে তুলিয়া দিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় না। যেভাবে গ্রহণে আমাদের অবমাননা হয়, সেভাবে গ্রহণ করিলে ক্ষতিই হইতে থাকে।

এইজন্যই কিছুদিন হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবের বিরুদ্ধে আমাদের মনে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। একটা আত্মাভিমান জন্মিয়া আমাদিগকে ধাক্কা দিয়া নিজের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

যে মহাকালের অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছি, সেই অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়াই এই আত্মাভিমানের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। আমরা নির্ব্বিচারে নির্ব্বিরোধে দুর্ব্বলভাবে দীনভাবে যাহা লইতেছিলাম, তাহা যাচাই করিয়া তাহার মূল্য বুঝিয়া তাহাকে আপন করিতে পারিতেছিলাম না, তাহা বাহিরের জিনিষ পোষাকী জিনিষ হইয়া উঠিতেছিল বলিয়াই আমাদের মধ্যে একটা পশ্চাদ্বর্ত্তনের তাড়না আসিয়াছে।

রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ, পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই; তাঁহার আপনার দিকে দুর্ব্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন; এইজন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল; কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মত আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জলিপূরণ করেন নাই।

যে শক্তি নব্য-ভারতের আদি অধিনায়কের প্রকৃতির মধ্যে সহজেই ছিল, আমাদের মধ্যে তাহা নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই কারণে সেই চেষ্টা পর্য্যায়ক্রমে বিপরীত সীমার চূড়ান্তে গিয়া ঠেকিতেছে। একান্ত অভিমুখতা এবং একান্ত বিমুখতায় আমাদের গতিকে আঘাত করিতে করিতে আমাদিগকে লক্ষ্যপথে লইয়া চলিয়াছে।

বর্ত্তমানে ইংরেজ ভারতবাসীর যে বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার একটা কারণ এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব;—ইংরেজের জ্ঞান ও শক্তিকে ক্রমাগত নিশ্চেষ্টভাবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে করিতে আমাদের অন্তরাত্মা পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। সেই পীড়ার মাত্রা

অলক্ষিতভাবে জমিতে জমিতে আজ হঠাৎ দেশের অন্তঃকরণ প্রবলবেগে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু কারণ শুধু এই একটিমাত্র নহে। ভারতবর্ষের গৃহের মধ্যে পশ্চিম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; তাহাকে কোনোমতেই ব্যর্থ ফিরাইয়া দিতে পারিব না, তাহাকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের তরফে সেই আপন করিয়া লইবার আত্মশক্তির যদি অভাব ঘটে, তবে তাহাতে কালের অভিপ্রায়বেগ ব্যাঘাত পাইয়া বিপ্লব উপস্থিত করিবে। আবার অন্যপক্ষেও পশ্চিম যদি নিজেকে সত্যভাবে প্রকাশ করিতে কৃপণতা করে, তবে তাহাতেও বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে।

ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ যাহা সত্য তাহার সহিত আমাদের যদি সংস্রব না ঘটে; ইংরেজের মধ্যে যদি প্রধানতঃ আমরা সৈনিকের বা বণিকের পরিচয় পাই, অথবা যদি কেবল শাসনতন্ত্রচালকরূপে তাহাকে আপিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি; যে-ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষ আত্মীয়ভাবে মিশিয়া পরস্পরকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে, সে-ক্ষেত্রে যদি তাহার সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ না থাকে, যদি পরস্পর ব্যবহিত হইয়া পৃথক হইয়া থাকি তবে আমরা পরস্পরের পক্ষে পরম নিরানন্দের বিষয় হইয়া উঠিবই। এরূপ স্থলে প্রবল পক্ষ সিডিশনের আইন করিয়া দুর্ব্বল পক্ষের অসন্তোষকে লোহার শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে অসন্তোষকে বাঁধিয়াই রাখা হইবে, তাহাকে দূর করা হইবে না। অথচ এই অসন্তোষ কেবল এক পক্ষের নহে। ভারতবাসীর মধ্যে ইংরেজের কোনোই আনন্দ নাই। ভারতবাসীর অস্তিত্বকে ইংরেজ ক্লেশকর বলিয়া সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবারই চেষ্টা করে। একদা ডেভিড্ হেয়ারের মত মহাত্মা অত্যন্ত নিকটে আসিয়া ইংরেজচরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে

আনিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন—তখনকার ছাত্রগণ সত্যই ইংরেজজাতির নিকট হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিল। এখন ইংরেজ অধ্যাপক স্বজাতির যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা কেবল যে আমাদের নিকটে আনিয়া দিতে পারেন না তাহা নহে, তাঁহারা ইংরেজের আদর্শকে আমাদের কাছে খর্ব্ব করিয়া ইংরেজের দিক হইতে বাল্যকাল হইতে আমাদের মনকে বিমুখ করিয়া দেন। তাহার ফল এই হইয়াছে, পূর্ব্বকালের ছাত্রগণ ইংরেজের সাহিত্য ইংরেজের শিক্ষা যেমন সমস্ত মন দিয়া গ্রহণ করিত, এখনকার ছাত্ররা তাহা করে না; তাহারা গ্রাস করে তাহারা ভোগ করে না। সেকালের ছাত্রগণ যেরূপ আন্তরিক অনুরাগের সহিত শেক্‌স্পীয়র, বায়রণের কাব্যরসে চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা দেখিতে পাই না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরেজ জাতির সঙ্গে যে প্রেমের সম্বন্ধ সহজে ঘটিতে পারে, তাহা এখন বাধা পাইয়াছে। অধ্যাপক বল, ম্যাজিষ্ট্রেট বল, সদাগর বল, পুলিসের কর্ত্তা বল, সকল-প্রকার সম্পর্কেই ইংরেজ তাহার ইংরেজি সভ্যতার চরম অভিব্যক্তির পরিচয় অবাধে আমাদের নিকট স্থাপিত করিতেছে না—সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজ-আগমনের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ, তাহা হইতে ইংরেজ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে; আমাদের আত্মশক্তিকে বাধাগ্রস্ত এবং আত্মসম্মানকে খর্ব্ব করিতেছে। সুশাসন এবং ভাল আইনই যে মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় তাহা লাভ নহে। আপিস আদালত আইন এবং শাসন ত মানুষ নয়। মানুষ যে মানুষকে চায়—তাহাকে যদি পায় তবে অনেক দুঃখ অনেক অভাব সহিতেও সে রাজি আছে। মানুষের পরিবর্ত্তে বিচার এবং আইন রুটির পরিবর্ত্তে পাথরেরই মত। সে পাথর দুর্লভ এবং মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা দূর হয় না।

এইরূপেই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সম্যক্ মিলনের বাধা ঘটিতেছে

বলিয়াই আজ যত কিছু উৎপাত জাগিয়া উঠিতেছে। কাছে থাকিব অথচ মিলিব না, এ অবস্থা মানুষের পক্ষে অসহ্য এবং অনিষ্টকর। সুতরাং একদিন না একদিন ইহার প্রতিকারের চেষ্টা দুর্দ্দম হইয়া উঠিবেই। এ বিদ্রোহ নাকি হৃদয়ের বিদ্রোহ, সেই জন্য ইহা ফলাফলের হিসাব বিচার করে না, ইহা আত্মহত্যা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত হয়।

তৎসত্ত্বেও ইহা সত্য যে এ-সকল বিদ্রোহ ক্ষণিক। কারণ পশ্চিমের সঙ্গে আমাদিগকে সত্যভাবেই মিলিতে হইবে এবং তাহার যাহা কিছু গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ না করিয়া ভারতবর্ষের অব্যাহতি নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফল পরিণত হইয়া না উঠিবে, ততক্ষণ তাহাকে বোঁটায় বাঁধা থাকিতে হইবেই—এবং বোঁটায় বাঁধা না থাকিলেও তাহার পরিণতি হইবে না।

এইবার একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ-শেষ করিব। ইংরেজের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ তাহা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সেজন্য আমরা দায়ী আছি। আমাদের দৈন্য ঘুচাইলে তবেই তাহাদেরও কৃপণতা ঘুচিবে। বাইবেলে লিখিত আছে, যাহার আছে, তাহাকেই দেওয়া হইবে।

সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে; তবেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যাহা দিতে আসিয়াছে, তাহা দিতে পারিবে। যতদিন তাহারা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিবে, ততদিন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন হইতে পারিবে না। আমরা রিক্তহস্তে তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইলে বার বার ফিরিয়া আসিতে হইবে।

ইংরেজের মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে বড় এবং সকলের চেয়ে ভাল তাহা আরামে গ্রহণ করিবার নহে, তাহা আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজ যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রতি ভাল হয়

তবে তাহা আমাদের পক্ষে ভাল হইবে না। আমরা মনুষ্যত্ব দ্বারা তাহার মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিয়া লইব। ইহা ছাড়া সত্যকে গ্রহণ করিবার আর কোনো সহজ পন্থা নাই। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা ইংরেজের কাছেও কঠিন দুঃখেই উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা দারুণ মন্থনে মথিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যথার্থ সাক্ষাৎলাভ যদি করিতে চাই তবে আমাদেব মধ্যেও শক্তির আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যাহারা উপাধি বা সম্মান বা চাকরীর লোভে হাত জোড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হয়, তাহারা ইংরেজের ক্ষুদ্রতাকেই আকর্ষণ করে, তাহারা ভারতবর্ষের নিকট ইংরেজের প্রকাশকে বিকৃত করিয়া দেয়। অন্যপক্ষে যাহারা কাণ্ড-জ্ঞানবিহীন অসংযত ক্রোধের দ্বারা ইংরেজকে উন্মত্তভাবে আঘাত করিতে চায়, তাহারা ইংরেজের পাপপ্রকৃতিকেই জাগরিত করিয়া তোলে। ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ইংরেজের লোভকে ঔদ্ধত্যকে, ইংরেজের কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাকেই উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে, এ যদি সত্য হয়, তবে এজন্য ইংরেজকে দোষ দিলে চলিবে না, এ অপরাধের প্রধান অংশ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বদেশে ইংরেজের সমাজ ইংরেজের নীচতাকে দমন করিয়া তাহার মহত্ত্বকেই উদ্দীপিত রাখিবার জন্য চারিদিক হইতে নানা চেষ্টা নিয়ত প্রয়োগ করিতে থাকে, সমস্ত সমাজের শক্তি প্রত্যেককে একটা উচ্চ ভূমিতে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য অশ্রান্তভাবে কাজ করে; এমনি করিয়া মোটের উপর নিজের নিকট হইতে যত দূর পর্য্যন্ত পূর্ণফল পাওয়া সম্ভব, ইংরেজ-সমাজ তাহা জাগিয়া থাকিয়া বলের সহিত আদায় করিয়া লইতেছে।

এদেশে ইংরেজের প্রতি ইংরেজ-সমাজের সেই শক্তি সম্পূর্ণ বলে কাজ করিতে পারে না। এখানে ইংরেজ সমগ্র মানুষের ভাবে কোনো

সমাজের সহিত যুক্ত নাই। এখানকার ইংরেজ-সমাজ হয় সিবিলিয়ান-সমাজ, নয় বণিক-সমাজ, নয় সৈনিক-সমাজ। তাহারা তাহাদের বিশেষ কার্য্যক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতার দ্বারা আবদ্ধ। এই সকল ক্ষেত্রের সংস্কার সকল সর্ব্বদাই তাহাদের চরিদিকে কঠিন আবরণ রচনা করিতেছে, বৃহৎ মনুষ্যত্বেব সংস্পর্শে সেই আবরণ ক্ষয় করিয়া ফেলিবার জন্য কোনো শক্তি তাহাদের চারিদিকে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে না। তাহারা এদেশের হাওয়ায় কেবল কড়া সিবিলিয়ান, পূরা সদাগর এবং ষোল আনা সৈনিক হইয়া পাকিয়া উঠিতে থাকে; এই কারণেই ইহাদের সংস্রবকে আমরা মানুযের সংস্রব বলিয়া অনুভব করিতে পারি না। এই জন্যই যখন কোনো সিভিলিয়ান হাইকোর্টের জজের আসনে বসে, তখন আমরা হতাশ হই; কারণ, তখন আমরা জানি এ লোকটির কাছ হইতে যথার্থ বিচারকের বিচার পাইব না, সিভিলিয়ানের বিচারই পাইব; সে বিচারে ন্যায়ধর্ম্মের সঙ্গে যেখানে সিভিলিয়ানের ধর্ম্মের বিরোধ ঘটিবে, সেখানে সিভিলিয়ানের ধর্ম্মই জয়ী হইবে। এই ধর্ম্ম ইংরেজের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিরও বিরুদ্ধ, ভারতবর্ষেরও প্রতিকূল।

আবাব যে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের কারবার, সেই ভারতবর্ষের সমাজও নিজের দুর্গতি দুর্ব্বলতা বশতই ইংরেজের ইংরেজত্বকে উদ্বোধিত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না; সেই জন্য যথার্থ ইংরেজ এদেশে আসিলে ভারতবর্ষ যে ফল পাইত সেই ফল হইতে সে বঞ্চিত হইতেছে। সেই জন্যই পশ্চিমের বণিক সৈনিক এবং আপিস আদালতের বড় সাহেবদের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, পশ্চিমের মানুষের সঙ্গে পূর্ব্বের মানুষের মিলন ঘটিল না। পশ্চিমের সেই মানুষ প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়াই এদেশে যাহা কিছু বিপ্লব বিরোধ, আমাদের যাহা কিছু দুঃখ অপমান। এবং এই যে প্রকাশ পাইতেছে না, এমন কি, প্রকাশ বিকৃত হইয়া যাইতেছে, সেজন্য আমাদের পক্ষেও যে পাপ আছে,

আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। "নায়মাত্মা বলহীনেন ...ঃ"—পরমাত্মা বলহীনের কাছে প্রকাশ পান না; কোনো মহৎ ...ই বলহীনের দ্বারা লভ্য নহে; যে ব্যক্তি দেবতাকে চায়, তাহার ...তিতে দেবতার গুণ থাকা আবশ্যক।

শক্ত কথা বলিয়া বা অকস্মাৎ দুঃসাহসিক কাজ করিয়া বল প্রকাশ ...। ত্যাগের দ্বারাই বলের পরিচয় ঘটে। ভারতবাসী যতক্ষণ পর্য্যন্ত ত্যাগশীলতার দ্বারা শ্রেয়কে বরণ করিয়া না লইবে, ভয়কে স্বার্থকে ...মকে সমগ্র দেশের হিতের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ...রেজের কাছে যাহা চাহিব তাহাতে ভিক্ষা চাওয়াই হইবে এবং যাহা ...ইব তাহাতে লজ্জা এবং অক্ষমতা বাড়িয়া উঠিবে। নিজের দেশকে ...ন আমরা নিজের চেষ্টা নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব, ...ন দেশের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের সমস্ত সামর্থ্য প্রয়োগ ...রিয়া দেশের সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচন ও উন্নতি সাধনের দ্বারা আমরা ...শের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিয়া লইব, তখন ...নভাবে ইংরেজের কাছে দাঁড়াইব না। তখন ভারতবর্ষে আমরা ...রাজরাজের সহযোগী হইব, তখন আমাদের সঙ্গে ইংরেজকে আপস ...রিয়া চলিতেই হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ...রেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ হইবে না। আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ...ক্তিগত বা সামাজিক মূঢ়তাবশত নিজের দেশের লোকের প্রতি ...যোচিত ব্যবহার না করিতে পারিব, যতক্ষণ আমাদের দেশের ...দার প্রজাদিগকে নিজের সম্পত্তির অঙ্গমাত্র বলিয়াই গণ্য করিবে, ...এ দেশের প্রবল পক্ষ দুর্ব্বলকে পদানত করিয়া রাখাই সনাতন ... বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পশুর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ইংরেজের নিকট হইতে সদ্ব্যবহারকে প্রাপ্য বলিয়া দাবী করিতে পারিব না; ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজের প্রকৃতিকে

আমরা সত্যভাবে উদ্বোধিত করিতে পারিব না এবং ভারতবর্ষ কেবলই বঞ্চিত অপমানিত হইতে থাকিবে। ভারতবর্ষ আজ সকল দিক হইতে পাপে ধর্মে সমাজে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে; নিজের আত্মাকেই সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা উদ্বোধিত করিতেছে না; এই জন্যই অন্যের নিকট হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইতেছে না। এই জন্যই পশ্চিমের সঙ্গে মিলন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ হইতেছে না; সে মিলনে পূর্ণ ফল জন্মিতেছে না, সে মিলনে আমরা অপমান ও পীড়াই ভোগ করিতেছি। ইংরেজকে ছলে বলে কৌশলে ফেলিয়া আমরা এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ পরিপূর্ণ হইলে, এই সংঘাতের সমস্ত প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তখন ভারতবর্ষে দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টার যোগসাধন হইবে, তখন বর্তমান ভারত ইতিহাসের যে পর্বটা চলিতেছে, সেটা শেষ হইয়া যাইবে এবং পৃথিবীর মহত্তর ইতিহাসের মধ্যে সে উত্তীর্ণ হইবে।